সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও প্রতিরোধ

আরিফুল হক

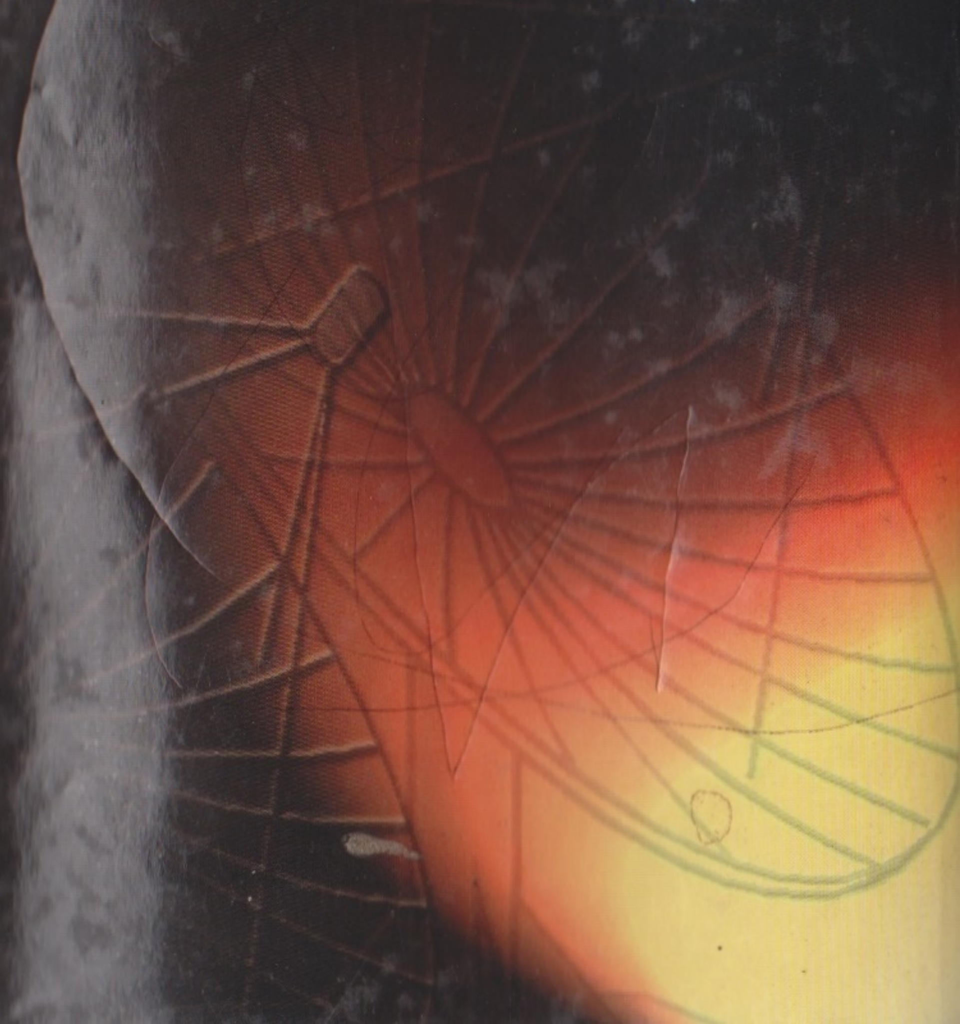

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও প্রতিরোধ

আরিফুল হক

দেশজ প্রকাশন

www.icsbook.info

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও প্রতিরোধ
আরিফুল হক

প্রকাশক
মাহবুবুর রহমান বুলবুল

দেশজ প্রকাশন
৪৩৯, শাহীনবাগ, তেজগাঁও, ঢাকা।

স্বত্ব
গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০০০

প্রচ্ছদ
গুলাম হুসেইন

অক্ষর বিন্যাস
এইচকে প্রিন্টার্স
১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, (৩য় তলা)
ফকিরাপুল, ঢাকা। ফোন ঃ ৪০৭৮০৪

মুদ্রণ
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি প্রেস
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

মূল্য ঃ ৮০ (আশি) টাকা

পরিবেশক
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১৫০-১৫২ , নিউ মার্কেট, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৬৬৩৮৬৩
৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
৭২, জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স, আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম।

SANGSKRITIK AGRASON 'O' PROTIRODH : Written by Ariful Haque. Published by : Mahbubur Rahman Bulbul, Deashojo Prokashan 439, Shaheenbagh, Tejgaon, Dhaka-1215. July 2000. Price in abroad : USA $2.00

ISBN— 984-31-0925-7

www.icsbook.info

উৎসর্গ

প্রিয়তমা স্ত্রী!
তোমাকে উৎসর্গিত প্রথম বই আলোর মুখ দেখলো না।
ঋণ রয়েই গেল। তাই এ বইটি তোমাকে উৎসর্গ
করে সে ঋণের বোঝা কিছুটা হাল্কা করলাম।

www.icsbook.info

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১.	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও প্রতিরোধ	৭
২.	বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও বিকৃতি	১৪
৩.	ধর্ম-রাজনীতি-সংস্কৃতি	১৮
৪.	আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য	২১
৫.	সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও ভাষা	২৫
৬.	গণমাধ্যম এখন গণবশীকরণে তৎপর	৩২
৭.	চলচ্চিত্রে নিজের মুখ	৩৬
৮.	গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন	৪১
৯.	মঞ্চ নাটক কোন্ পথে	৪৫
১০.	মসজিদ নগরী কি মূর্তি নগরীতে রূপান্তরিত হবে	৪৮
১১.	"তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো"	৫২
১২.	বাংলাদেশে বাউল চর্চা ও আমরা	৫৬
১৩.	মেলা আর নাই সে মেলা	৬১
১৪.	নিধুবনের বসন্ত উৎসব	৬৪
১৫.	ঈদ সংস্কৃতি	৬৮
১৬.	আমাদের পরিচয়টা কি	৭৩
১৭.	আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি	৭৭
১৮.	সাংস্কৃতিক পরাধীনতাই জাতির প্রকৃত পরাধীনতা	৮১
১৯.	বাঙালী জাতিসত্তার বিকাশে মুসলমানদের অবদান	৮৬
২০.	ইসলাম ও সংগীত	৯১

www.icsbook.info

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

ভূমিকায় তেমন কিছু আর বলার নেই, যা বলার ছিল, বিভিন্ন সময়ে লেখা এই প্রবন্ধগুলোর মধ্যেই ব্যক্ত করেছি। এককালে লেনিন-স্ট্যালিনের সহকর্মী হয়ে কাজ করেছিলেন যিনি, যিনি সান-ইয়াৎ সেন সহ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের সকল বিশ্ব- ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছিলেন, সেই বিখ্যাত মানবেন্দ্র নাথ রায় (এম.এন. রায় নামে সবিশেষ পরিচিত) The Historical role of Islam নামে এক বিখ্যাত বই লিখেছিলেন। সেই বই-এর এক জায়গায় তিনি বলছেন— "মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেই য়ুরোপ আধুনিক সভ্যতার অধিনায়ক হয়ে রইলো। এমনকি আজও তার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা অতীত ঋণের এই বোঝা স্বীকার করতে সঙ্কুচিত হন না। দুর্ভাগ্য আমাদের, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইসলামের সংস্কৃতি সম্পদ থেকে ভারত তেমন উপকৃত হতে পারেনি। কেননা, অনুরূপ সম্মানের অধিকারী হবার যোগ্যতা তার ছিল না। এখনও এই বিলম্বিত রেনেসাঁর সৃষ্টি বেদনায় মানবেতিহাসের এই অবিস্মরণীয় অধ্যায় থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতবাসীরা প্রভূত লাভবান হতে পারে।" একজন আজীবন নিষ্ঠাবান কমিউনিস্ট, যিনি ভারতবাসী হয়েও সুপ্রীম সোভিয়েতের পলিট ব্যুরোর সদস্য হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন, সেই এম.এন. রায় বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইসলামী সংস্কৃতি সম্পদ থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে ভারতবর্ষ প্রভূত লাভবান হতে পারে। একজন আপাদমস্তক কমিউনিস্ট সমাজতন্ত্রী যা বুঝতে পেরেছিলেন, আমরা বাংলাদেশের ১২ কোটি মুসলমান, তা বুঝতে সক্ষম হইনি। মিঃ এম.এন. রায় আরও বলেছেন, "ইসলামের সমাজ ব্যবস্থায় জীবনের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, হিন্দু দর্শনের চাইতে তা ছিল শ্রেয়। কেননা, হিন্দু দর্শনই সমাজদেহে এনেছিল বিরাট বিশৃংখলা, আর ইসলামই তা থেকে ভারতীয় জনসাধারণকে মুক্তির পথ দেখায়।" একদিন যারা পথভ্রষ্টকে পথ দেখিয়েছিলেন, আজ সেই মুসলমানরাই পথ হারিয়ে অন্ধকার কর্দমাক্ত গলিতে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। তাওহীদবাদী ১২ কোটি মুসলমানের এই দেশে অগ্নি দেবতার আগমনের আশায় মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে শুভকাজ উদ্বোধনের রেওয়াজ চালু হয়েছে। হিন্দু নারী সমাজের ব্রতের দেবতার শঙ্খ-পদ্ম, লক্ষ্মীর পা, ভ্রমরপদ্ম, পদ্মপত্রে লক্ষ্মীনারায়ণ ইত্যাদির অনুরূপ আলপনা এঁকে শুভ অনুষ্ঠানে কামনার অনুকূল সুফল পাওয়ার জন্য মুসলমান সংস্কৃতিকর্মীরা কাজ করছে। জাদু-টোনায় বিশ্বাসী নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রেতাত্মার প্রভাব দূরীকরণ প্রচেষ্টার অনুকরণে মুসলমান ছেলেমেয়েরা মুখোশ পরে সং সাজার রেওয়াজ চালু করেছে। হিন্দু তান্ত্রিক বামাচারীদের অনুকরণে দল বেঁধে যৌনাকর্ষণমূলক নৃত্য গীতের মাধ্যমে যুবক-যুবতীর যৌনবোধের উদ্রেক এবং মিলনাসক্তি তীব্র করার উপযোগী মিছিল সংস্কৃতি চালু করেছে। হিন্দু মঙ্গলাচরণের অনুকরণে ঢাকের বাদ্য, কাঁসর ঘন্টা, উলুধ্বনি দিয়ে মুসলিম মনীষীর জন্মদিবস-মৃত্যুদিবস পালনের রেওয়াজ চালু করেছে। আজ বাংলাদেশের সংস্কৃতির সর্বত্রই একটা বিকৃত রুচির ছাপ সুস্পষ্ট। অথচ এই অবতারবাদী সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব জাতিসত্তা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবনাচার নিয়ে বাস করার জন্যই মুসলমানরা নিজস্ব হোমল্যান্ড সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিল। আজ সেই সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য মুছে ফেলে সব কিছু একাকার করার এক সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অথচ বাংলাদেশের মুসলিম সমাজ নিষ্ক্রিয় নীরব।

নৌকা সব দেশেই জলযান। কিন্তু বার্মার নৌকা আর বাংলার নৌকা দেখতে এক রকম নয়। মন্দির-মসজিদ সবই উপাসনালয়, কিন্তু ধর্মবোধ ও রুচিবোধ অনুযায়ী এদের গঠন প্রণালী আলাদা ধরনের। এদেশে হিন্দু-মুসলমান,

www.icsbook.info

বৌদ্ধ-খ্রীস্টান পাশাপাশি বাস করলেও প্রত্যেকের সংস্কৃতির চেহারা এক রকম নয়। মুসলমানদের সংস্কৃতি ইসলামী ধর্মবোধ দ্বারা প্রখরভাবে নিয়ন্ত্রিত।

ইসলামী সংস্কৃতি নিছক আনন্দভোগের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেনি, আনন্দের সাথে সাথে ত্যাগ ও সংযম পালনের মাধ্যমে আদর্শ জীবন যাপনেরও নির্দেশ দিয়েছে।

আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, যে দেশের সংখ্যাগুরু মানুষ যে সংস্কৃতির ধারক, সেই দেশের সংস্কৃতিও গড়ে ওঠে মূলতঃ সেই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় গিয়ে চার্চ সংস্কৃতির পরিবর্তে মসজিদ বা মন্দির সংস্কৃতি চালু করা যাবে না। ভারতবর্ষে নারকেল ভেঙ্গে জাহাজ উদ্বোধনের পরিবর্তে যেমন কোরআন পাঠ করে উদ্বোধন সম্ভব নয়, তেমনি বাংলাদেশেও কোরআন পাঠের পাশে গীতা পাঠ আশা করাটা ঠিক নয়। তারপরও একদল মানুষ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সেই অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। সেখানেই আমাদের সাংস্কৃতিক পরাজয় এবং ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণের কুফল আমরা হাতে হাতে পাচ্ছি।

আজ চারিদিকে অবক্ষয়। আমাদের সামাজিক সূত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আজ বাংলাদেশের যৌবন সৃজনশীলতার রঙীন স্বপ্ন দেখতে ভুলে গেছে। তার হাতে এখন বোমা, বারুদ, পিস্তল, নারকটিকসের বিষধর সাপ। দেশে বাড়ছে শিক্ষিত চোরা-কারবারী, স্নাতক ডাকাত, গ্রাজুয়েট প্রমোদবালা। অপরাধ জগত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, নিষিদ্ধ পল্লী উঠে এসেছে সম্ভ্রান্ত এলাকায়, মেধা পাচার হয়ে যাচ্ছে বিদেশের বাজারে— এ সবই সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশ। বিছানায় নোংরা চাদর পাতা থাকলে যে কেউ সেখানে পা তুলে বসতে চাইবেন, কিন্তু শুচিশুভ্র চাদর পেতে দিলে পা তুলে বসতে সংকোচবোধ করবেন। আজ সংস্কৃতির বিছানায় শুভ্র চাদর পেতে, নোংরা পদধারীদের দূরে সরিয়ে দিতে হবে। যারা নোংরা চাদর সরিয়ে, শুচিশুভ্র চাদর বিছানোর আকাংখায় সাংস্কৃতিক সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ নিবেদিত।

এই বই-এর সব প্রবন্ধই বিভিন্ন সময়ে বিশিষ্ট দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়ে পাঠকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল। প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী প্রবন্ধগুলি সাজানো হয়নি। সাজানোর ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

দেশের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক, আমার লেখার একনিষ্ঠ পাঠক, সুহৃদ মুহাম্মাদ আবদুল হান্নান সাহেবের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় এই বই প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য।

আমার একান্ত কাছের মানুষ অতি নিকট-আত্মীয় শিল্পী গুলাম হুসেইন বইটির প্রচ্ছদ এঁকে অশেষ উপকার করেছেন, শুধু ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর ঋণ শোধ করা যাবে না।

বইটির সার্বিক প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমার স্নেহাস্পদ মাহবুবুর রহমান বুলবুল যে অসীম শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করেছেন, তার জন্য তাকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ।

পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকবর্গ যে আগ্রহ নিয়ে প্রবন্ধগুলি পাঠ করে তাঁদের উৎসাহী মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন, একই আগ্রহ নিয়ে বইটি পাঠ করে এ দেশের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ভয়াবহতা প্রতিরোধে উৎসাহী হলে খুশী হব।

সবশেষে বইটি প্রকাশিত হওয়ায় পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি।

আরিফুল হক

www.icsbook.info

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও প্রতিরোধ

এ কথাটা বহুজনের উৎকণ্ঠিত অভিমত যে, বাংলাদেশে বিজাতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এখন ভয়াল-ভয়ংকর রূপ ধারণ করে গোটা জাতিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। এ মন্তব্য শুধু বিশেষ কিছু মানুষের মতামতেই সীমাবদ্ধ নেই, এর বিষক্রিয়া সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পচন ধরিয়ে দিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষভাবে জানান দিচ্ছে যে, অপসংস্কৃতির দূষণক্রিয়ায় গোটা জাতি আজ কিরূপ বিপর্যস্ত। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে গোটা জনজীবন কীভাবে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে সে কথা কারো অভিমত, ভাষণ বা বিবৃতি শুনে উপলব্ধি করতে হয় না। ঘরে বসেই আন্দাজ করা যায়, সেই ভয়াবহ অবস্থার আঁচ টের পাওয়া যায়।

আজ রাজনীতিতে মলমূত্র নিক্ষেপ সংস্কৃতি, সংসদে বস্তিবাসীসুলভ খিস্তিখেউড় সংস্কৃতি, আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি, নিরাপত্তা কর্মীদের হাতে মানুষ খুন, কাস্টডিতে নারীধর্ষণ, শিশুধর্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শত ছাত্রীধর্ষণ উৎসব পালন, অফিসে অফিসে ঘুষ, বাড়ীতে ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ, শিক্ষালয়ে ডোনেশন, পথে ছিনতাই, চাঁদাবাজি, এসিডনিক্ষেপ প্রভৃতি ঘটনা দেশকে এক নরককুন্ডে পরিণত করেছে। সভ্যতা, সংস্কৃতি, মনুষ্য সমাজ ব্যবস্থা প্রভৃতি কথাগুলো বাংলাদেশের জন্য অচল প্রমাণিত হয়েছে। এগুলো সবই সাংস্কৃতিক দূষণ প্রক্রিয়ার ফসল।

বিদেশ থেকে আসা প্লেবয় জাতীয় যৌন উত্তেজক বই ও পত্রিকায় ফুটপাত স্টল ভরে গেছে। রাস্তার পাশে বোম্বের উদোম নারীদেহের পোস্টার যুবকদের কুপথে আহবান জানাচ্ছে। স্যাটেলাইটের ৬৭টি ভারতীয় চ্যানেল দিয়ে ২৪ ঘন্টাব্যাপী প্রচার করা হচ্ছে ব্লু-ফিল্ম জাতীয় যৌনতায় ঠাসা চলচ্চিত্র, নাটক, নাচ ও গান। ভারতীয় যৌন উত্তেজক চলচ্চিত্রের আকর্ষণে বাংলাদেশের দর্শকরুচি বিকৃতি ঘটায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্রও যৌন সুড়সুড়ি ভরা কেচ্ছাকাহিনী নির্ভর হয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে। এসবই সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফসল।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। যুদ্ধ বা আগ্রাসন তিন ধরনের হতে পারে। একটি সামরিক আগ্রাসন,একটি অর্থনৈতিক আগ্রাসন এবং অপরটি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। এই তিনটিরই উদ্দেশ্য এক, দেশ জয় করা। আজকাল সৈন্য পাঠিয়ে দেশ জয় করার পুরনো পদ্ধতি বাতিল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহতা দেখে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ভাবতে লাগল, যুদ্ধ ছাড়াই কীভাবে একটি দেশকে আত্মসাৎ করা যায়। অর্থনৈতিক শোষণের পথ আবিষ্কার করতে গিয়ে তারা

www.icsbook.info

দেখল,একটা দেশের স্বাতন্ত্র্যবোধ, অহংবোধ, জাতিসত্তা মুছে দিতে পারলেই চিরস্থায়ীভাবে সেই দেশটিকে পদানত করে রাখা সম্ভব। উক্ত চিন্তার ফলশ্রুতি হিসেবেই আবিষ্কৃত হল সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বর্তমান ধারা। এর বাহন বা মূল অস্ত্র হিসেবে বেছে নেয়া হল প্রচার মিডিয়া এবং সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি প্রকাশের বিষয়বস্তুকে। উপনিবেশবাদী প্রচার মিডিয়াসমূহ সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিগুলোকে, যেমন- নাচ, গান, নাটক, সিনেমা, থিয়েটার, সাহিত্য, কবিতা প্রভৃতিকে এমনভাবে ব্যবহার করার কৌশল উদ্ভাবন করল,যাতে করে এগুলোর মাধ্যমে দেশের মানুষকে এমন ভাবে গড়ে তোলা যায় যাতে তাদের মধ্যে সংস্কারবদ্ধতা, শিকড়হীন অস্তিত্ব, সাংস্কৃতিক, কসমোপলিটন ইজম, ধর্মের প্রতি অনাস্থা, স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি হীনমন্য বৃত্তিগুলো মাথাচড়া দিয়ে ওঠে। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শক্তি মিডিয়া শক্তির সাহায্যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে স্বনির্ভর স্বাধীন দেশের মানুষগুলোর মধ্যে এমন এক ধরনের হীনমন্যতা বোধ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়— যাতে প্রভুর নির্দেশে মোহাচ্ছন্নের মত তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতিরোধ শক্তি এবং আত্মরক্ষার পাঁচিলটিকে বিধ্বস্ত করে গুঁড়িয়ে দেয়। সাংস্কৃতিকভাবে পরাভূত জাতির অহংবোধ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায়, ওদের সব ভাল, আমাদের কিছু নেই, আমি ওদের মত হব, এ ধরনের হীনমন্য বৃত্তিগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষমতাটুকুও তাদের হারিয়ে যায়। সাংস্কৃতিক জাতিসত্তা বজায় না থাকলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকে না। এ জন্য বলা হয়, রাজনৈতিক পরাজয় থেকে দেশোদ্ধার সম্ভব, কিন্তু সাংস্কৃতিক পরাজয় ঘটলে দেশের স্বাধীনতা উদ্ধার আর সম্ভব হয় না। কোন জাতির সাংস্কৃতিক সত্তা বজায় না থাকলে তার মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাংখাও আর থাকে না।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই নজরে পড়ে যে, দেশটি বর্তমানে চরম সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হয়ে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাতে বসেছে।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলেই দেশের অভ্যন্তরে হুহু করে ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনীতিতে বিদেশী বশংবদ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অধিকাংশই বিদেশী স্কলারশীপ, পদক, খেতাব, পুরস্কার এবং নগদ অর্থপ্রাপ্তির লোভে লালায়িত হয়ে আত্মবিক্রয় করে বিদেশের দালাল শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে বসে আগ্রাসী শক্তির স্বার্থে তারা নিজেদের মেধা ও কার্যকলাপ পরিচালনা করেছে।

www.icsbook.info

—বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকেই ২৮ বছর ধরে ভারত সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে এদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানকে ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়েছে। '৭১-এর পর তাদের সকল প্রচার মিডিয়াকে বাংলাদেশের মুসলমানদের মগজ ধোলাইয়ের কাজে ব্যবহার করে এদেশের জন্ম-ইতিহাস সম্পর্কে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের পরিকল্পিত প্রচারের মাধ্যমে পাকিস্তানবিরোধকে ইসলামবিরোধ হিসেবে জনগণের মন-মগজে গেঁথে দিতে সক্ষম হয়েছে। পাকিস্তান সৃষ্টি এবং তার ২৩ বছরের ইতিহাসই শুধু নয়, এ দেশের মুসলমানদের হাজার বছরের গৌরবজনক সমৃদ্ধ সোনালী ইতিহাসকে বিকৃত করে নবপ্রজন্মকে শেখানো হয়েছে যুগে যুগে ইসলামের নামেই নাকি পূর্ববাংলার মানুষ শোষিত-বঞ্চিত হয়েছে। সুতরাং ইসলামের সাথে সম্পর্ক রাখা বাঙালী মুসলমানের স্বার্থের পরিপন্থী। ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা গোঁড়া মৌলবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। আশ্চর্যের কথা, বিশেষ সুবিধাভোগী প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের যারা কলিকাতায় বসে যুগের পর যুগ ধরে এদেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল, ব্রিটিশদের সহায়তায় এদেশের মানুষের রক্ত নিংড়ে এদেশের নাঙ্গাভুখা মানুষের রক্তে-ঘামে উৎপাদিত শ্রমের ফসলের পয়সায় কলকাতার সমৃদ্ধি ঘটাল, পূর্ব বাংলার মানুষের রক্ত নিংড়ে নিয়ে বোলপুরে 'শান্তিনিকেতন' গড়ে তুলল— তারা হয়ে গেল আপনজন। আর যারা উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একখন্ড স্বাধীন আবাসভূমি সৃষ্টির সংগ্রামে জীবন দিল, নিজেদের জমিদারী বেচে অবহেলিত পূর্ববঙ্গের মানুষের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলল, নিজেরা তুর্কী, ফার্সী বা উর্দুভাষী হয়েও বাংলা ভাষাকে জাতে তুলল, মগবর্গীয় দস্যুদের হাত থেকে এদেশের সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করল, তারা হয়ে গেল উৎপীড়ক বা শত্রু। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে একটি জাতি কিভাবে মোহাচ্ছন্ন, হিপনোটাইজড বা সংবিষ্ট হয়ে আত্মহননের পথে এগিয়ে যায়, বাংলাদেশ তারই জ্বলন্ত উদাহরণ।

'৭১-এর পর মুসলিম জাতিসত্তা মুছে গিয়ে আমরা হলাম বাঙালি। এভাবেই আমাদের চিন্তা-চেতনায়, ঐতিহ্যরীতিতে, সাধে, অভিলাষে, ভারতীয় হিন্দু রাষ্ট্রদর্শনের দুরভিসন্ধিমূলক জাতীয়তাবাদের চেতনা এমন ভাবে ইনজেক্ট করে দেওয়া হল যে, মানুষ ভুলে গেল বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রটির জন্ম-ইতিহাস কী, এর প্রয়োজনীয়তাই বা কী ছিল!

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে দেশের মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হল যে, ভারতীয় হিন্দুদের বহু-ঈশ্বরবাদ, সামাজিক বৈষম্য, গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি ও একমুখী কল্যাণের আদর্শের সাথে উপমহাদেশের মুসলমানদের একেশ্বরবাদ, সাম্য, সামাজিক সুবিচার, ন্যায় ও

www.icsbook.info

কল্যাণবোধের সংস্কৃতির সহাবস্থান সম্ভব ছিল না বলেই ১৯৪৭ সালে দেশটি ভাগ করে মুসলিম হোমল্যান্ড নির্মাণের প্রয়োজন হয়েছিল এবং সেই একই কারণে '৭১ সালে সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভারত বাংলাদেশকে দখল করে নিতে সাহস করেনি, কিংবা বাংলাদেশের মানুষের আলাদা আইডেনটিটি বজায় রাখার জন্য তারাও সেদিন সিকিমের মত ভারতের সাথে মিশে যায়নি।

বিগত ২৮ বছর ধরে ভারত সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে বাংলাদেশের মানুষের সেই স্বতন্ত্র পরিচয় বা সেপারেট আইডেনটিটি মুছে দেয়ার কাজটি করে চলছে। ১২ কোটি মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসকে বলা হচ্ছে মৌলবাদ। মুসলিম জাতিসত্তার বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে বাঙালি নামক হিন্দুত্ববাদী খোদাবিমুখ জাতীয়তাবাদ। কুরআন-হাদীসভিত্তিক ধর্মবিশ্বাসকে সংকীর্ণতা ও অন্ধত্ব বলে অভিহিত করে, ঔদার্যের নামে আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহী প্যাটার্নের সেকুলারিস্ট ধর্ম ব্যবস্থাপনার প্রচলন করা হচ্ছে। যে ইসলামের ভিত্তি, জীবন পদ্ধতি এবং আচরণ নির্মিত হয়েছে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস, ওহী ও রিসালাতের প্রতি প্রত্যয় এবং আখেরাতের প্রতি আস্থা স্থাপন করে, সেই ৯৫ ভাগ মুসলমানের দেশে সরকারী অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করা হচ্ছে একেশ্বরবাদী কুরআনের সাথে সাথে বহু-ঈশ্বরবাদী গীতা, ঈশ্বরহীন ত্রিপিটক বা বাইবেল পাঠ করে। শত আওলিয়া আর লাখো মসজিদের দেশকে বিধর্মীদের মূর্তির পীঠস্থানে পরিণত করা হচ্ছে। মঙ্গল প্রদীপ কালচারের বহুল প্রচলন, জাতীয় অনুষ্ঠানমালায় উলুধ্বনি, শংখরব, রাখি বন্ধন, হোলিখেলা, উলঙ্গ নৃত্য, থার্টিফাস্ট নাইটের উচ্ছৃংখলতা, ভরত নাট্যম, শ্যামা, রবীন্দ্রনাথ, তসলিমা নাসরিন প্রভৃতিকে আমাদের সংস্কৃতির প্রতিভূ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

—সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ফলে গোটা সমাজ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন— জাতীয় সংসদ, প্রশাসন বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ধ্বংস হতে চলেছে।

দেশের সবক'টি নদী আজ ভারতের নিয়ন্ত্রণাধীন। স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের বেরুবাড়ী, তালপট্টি, মুহুরীর চরে ভারতীয় পতাকা উড়ছে। সীমান্ত অরক্ষিত। দেশের এক-দশমাংশ সমৃদ্ধ ভূভাগ শত্রু কবলিত হয়ে হাতছাড়া হতে বসেছে। সমুদ্রের পানি সীমানায় আমাদের অধিকার নেই। দেশের একমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাসক্ষেত্রগুলো বিদেশীদের হাতে ইজারা দেওয়া হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা বিপর্যস্ত। শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দেশ ভারতীয় মালামালে সয়লাব হয়ে গেছে। দেশের ভারতপন্থী সরকার পানি সম্পদ, গ্যাস সম্পদ, সমুদ্র বন্দর, করিডোরসহ সবকিছু ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য উদগ্রীব। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব চরমভাবে

www.icsbook.info

বিপন্ন জেনেও, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মনে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তারা তন্দ্রাচ্ছন্নের মত এখন দেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানী চর, পাকিস্তানী রাজাকার এবং '৭১-এর ঘাতক দালাল অনুসন্ধান করছে।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে গোটা জাতি আজ অবসন্ন। তাদের জেহাদী প্রাণশক্তি নিস্তেজ করে দেওয়া হয়েছে। ইজতিহাদী শক্তি নিস্প্রভ হয়ে গেছে।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটা যুদ্ধ। এই যুদ্ধের শত শত মিসাইল এসে আমাদের বংশধরদের ইসলামী চেতনা বিশ্বাসকে চুরমার করে দিচ্ছে। অপসংস্কৃতির তুফান আমাদের রাজনীতিবিদ, অধ্যাপক, ছাত্র, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী মহলকে হিপ্নোটাইজড করে জাতীয় বেঈমানের কাতারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ আমাদের আলিম সমাজ, জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী রাজনীতিবিদরা এই আগ্রাসনের গতি-প্রকৃতি ও মানসিক গড়নকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা দূরে থাক, তাদের সচেতনতাও আছে বলে মনে হয় না। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের একতরফা যুদ্ধের হাতে দেশকে সঁপে দিয়ে তারা দেশ বাঁচানোর রাজনৈতিক সমাধান খুঁজছেন। প্রচার মিডিয়ার সবক'টি দিক আজ অরক্ষিত। ১) রেডিও, ২) টেলিভিশন, ৩) চলচ্চিত্র, ৪) নাট্যশালা এবং নাটক, ৫) বিজ্ঞাপন শিল্প, ৬) সংগীত শিক্ষালয়, ৭) নাট্য বিদ্যালয়, ৮) আর্ট স্কুল, ৯) ফ্যাশন শো, ১০) মেলা, ১১) জাদুঘর, ১২) ভাস্কর্য, ১৩) শিক্ষাঙ্গন, ১৪) লাইব্রেরী, ১৫) খেলাধুলা, ১৬) সংবাদপত্র, ১৭) সাহিত্য, ১৮) পাঠ্য-পুস্তক, ১৯) সেমিনার, ২০) এনজিও, ২১) ধর্মাচরণ, ২২) স্মরণোৎসব, ২৩) রাজনৈতিক দর্শন, ২৪) স্যাটেলাইট বা আকাশ সংস্কৃতি, ২৫) ম্যাগাজিন। এভাবে কমপক্ষে ২৫টি সেক্টর থেকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মিসাইল এসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, ইসলামী মূল্যবোধের আদর্শকে চুরমার করে দিচ্ছে। অথচ আলিম সমাজ, জাতীয়তাবাদী বা ইসলামী রাজনৈতিক শক্তিসমূহ সেক্ষেত্রে শুধু ঘৃণা প্রকাশ করেই তাদের দায়িত্ব স্খলন করছেন, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। ইসলামী চিন্তাবিদগণের ধারণা, তাঁরা ১৪শ' বছর আগের প্রচার কৌশলকে অবলম্বন করেই এই অপসংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে ঠেকাতে কামিয়াব হবেন। তাঁরা প্রতিটি ব্যাপারই কিতাবাদিতে খোঁজ করছেন কিংবা এমনসব মানুষের কাছে সমাধান খুঁজছেন, যাদের মধ্যে নবী-রাসূলদের মত বন্ধনমুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গি নেই।

বর্তমান যুগে রেডিও এবং টেলিভিশন এই দুটি অত্যন্ত শক্তিশালী গণযোগাযোগ মাধ্যম। এ দু'টি মাধ্যমের একটিও জাতীয়তাবাদী বা ইসলামী চিন্তাবিদদের হাতে নেই। হাতে নেয়ার চেষ্টাও তারা করে না।

www.icsbook.info

চলচ্চিত্র, নাট্যশালা, থিয়েটার হলগুলো তো সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধীদের দখলে। কারণ ইসলামপন্থীরা এই গণমাধ্যমগুলোকে হারাম বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন।

সংগীত শিল্প, বিজ্ঞাপন শিল্প প্রভৃতি নিয়ে ইসলামপন্থীরা মাথা ঘামান না। ফ্যাশন শো, মেলা, জাদুঘর সম্পূর্ণ অনৈসলামী কালচারের মাহাত্ম্য প্রচার করছে। শিক্ষাঙ্গন (জেনারেল এডুকেশন), বইপত্র, সিলেবাসসমূহ সম্পূর্ণ অবতারবাদী চিন্তাধারায় পুষ্ট। লাইব্রেরী নির্মাণ, খেলাধুলা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দিকে মুসলিম জাতীয়তাবাদীরা সম্পূর্ণ উদাসীন। সংবাদ সংস্থা এবং সংবাদপত্রে তাদের অবদান নেই বললেই চলে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের যৎসামান্য অবদান থাকলেও জনসাধারণের উপর তার প্রভাব খুবই সামান্য। প্রকাশনা শিল্পেও তাদের নজর নেই। দেশজুড়ে অনৈসলামী এনজিওগুলোর পাশে দু'একটি মুসলিম এনজিও কোন রকমে খুঁড়িয়ে চলছে।

এদেশে বিদেশী শক্তির বশংবদদের হাতে স্মরণোৎসবের নামে রবীন্দ্র, বংকিম, জীবনানন্দ, মাইকেল, সূর্যসেন, বিদ্যাসাগর, প্রীতিলতা এমনকি কেরী সাহেবরা যত প্রাধান্য পান আমাদের জাতীয় অগ্রনায়করা যেমন- নজরুল, ফররুখ, কায়কোবাদ, গোলাম মোস্তফা, শাহাদাৎ হোসেন, ইকবাল, সিরাজুদ্দৌলা, চাঁদ সুলতানা, রজব আলী, তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, আমীর আলী, নওয়াব আবদুল গনী, নওয়াব সলিমুল্লাহ প্রমুখ স্মরণীয় মানুষগুলোকে ততটাই অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়।

স্যাটেলাইট মিডিয়ার প্রযুক্তিকে তো তারা শয়তানের আস্তানা বলে দূরে ঠেলে রেখেছেন। অর্থাৎ আধুনিক দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক স্থাপনে তারা নিজেরাই নিজেদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী বা ইসলামী শক্তির কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাতো নেই, এমনকি সেখানে কোন সচেতন পাহারাদার পর্যন্ত নেই, যিনি এই আগ্রাসনের ক্ষতির দিকটা সম্পর্কে জাতিকে সচেতন করবেন।

কালচার হচ্ছে জাতির প্রাণ। সেই প্রাণশক্তিকে অরক্ষিত রেখে জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তিসমূহ জাতিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। প্রাণ অরক্ষিত রেখে শুধু শরীরের হেফাযত করলে যেমন প্রাণে বাঁচা যায় না, তেমনি কালচারকে আগ্রাসনের মুখে ঠেলে দিয়ে জাতিকে বাঁচানোর চেষ্টাও তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য হচ্ছে।

ইসলাম চিরকালই প্রগতির ধর্ম, আধুনিকতার ধর্ম। সময়ের আগে চলতে পেরেছিল বলেই একদিন অতি দ্রুত ইসলামের বিশ্ববিজয় সম্ভব হয়েছিল। একদিন জিহাদ ও ইজতিহাদের ঝান্ডাকে তুলে নিয়ে তারা জ্ঞান ও কর্মের ক্ষেত্রে সকলের আগে এগিয়ে গিয়েছিল। আজকের মুসলমান আধুনিক সভ্যতার নীতি ও ভিত্তিমূলকে উপলব্ধি করতে

www.icsbook.info

ব্যর্থ হচ্ছে। কার্যকরী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে ইজতিহাদী শক্তির দ্বারা আয়ত্ত করে, ইসলামী নীতির আলোকে মুসলমানদের কল্যাণের কাজে কিংবা শিক্ষা-কৃষ্টি ও সমাজ জীবনে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তর্ক দিয়ে যুগের গতিকে বদলানো যাবে না। যুগের জোয়ারের মুখে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব নয়। হয় স্রোতের মুখে ভেসে যেতে হবে, নয়তো পূর্ণ বিক্রমে স্রোতের গতিমুখ ঘুরিয়ে দিতে হবে।

আজকের অনৈসলামী দুনিয়া মুসলমানদের চৈতন্য আবেগকে বশীভূত করার জন্য সংস্কৃতির যে দিকগুলো বেছে নিয়েছে যেমন- সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট ইত্যাদি, সেগুলো উপেক্ষা করে নয়, বরং সেগুলোকে পুরোপুরি আয়ত্ত করে, সেখান থেকে ইসলামবিরোধীদের হটিয়ে দিয়ে ইসলামের এবং মানব কল্যাণের কাজে লাগানোই হবে মুসলমানদের জন্য বুদ্ধিমানের কাজ। সে জন্য উপরোক্ত ২৫টি সেক্টরের প্রত্যেকটি দখল করে ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড়ানোই হবে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ করার একমাত্র উপায়। শুধু লিখে বা মুখে প্রচার করে ইসলামের মাহাত্ম্য কীর্তনে কোন লাভ হবে না, ইসলামের সৌন্দর্যকে বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করে দেখাতে হবে। তার জন্য চাই প্রস্তুতি, জ্ঞানার্জন, অনুশীলন এবং বিভিন্ন আর্টফর্মের যথাযথ ব্যবহার।

আমাদের মনে রাখতে হবে— সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটা সর্বাত্মক যুদ্ধ। যুদ্ধকে যুদ্ধ দিয়েই জয় করতে হয়। তার জন্য পুরনো মরচে পড়া অস্ত্র নিয়ে দাঁড়ালে জয় সম্ভব নয়— চাই উত্তম, আধুনিক অস্ত্র এবং ট্রেনিং। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, এই জন্য নয় যে, তারা ক্রমবিকাশের পথে পশ্চাৎপ্রহরী হিসেবে পড়ে থাকবে। তাদের হতে হবে অগ্রনায়ক। প্রগতির ধারায় নেতৃত্বদান বা ইমামতি করার জন্যই মুসলমানদের ইমাম হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই ইমাম পড়ে আছে পিছনে।

১০.১১.৯৯

www.icsbook.info

বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ ও বিকৃতি

আমাদের সমস্যা অনেক। খুব স্থিরভাবে ভেবে দেখার বিষয় অনেক জমে গেছে। গুরুত্ব হিসাবে কোন্‌টা আগে বেছে নেব— সেটাই বিচার্য বিষয়। আমার মনে হয়, সে ক্ষেত্রে সংস্কৃতির কথাটাই আগে উঠে আসে, কারণ সংস্কৃতির সাথে আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। বিশেষ করে এ বিষয়টি নিয়ে যখন একটা বিবাদ লাগিয়ে জাতিকে বিভক্ত করে রাখা হয়েছে, তখন বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ কেমন ছিল, এখন কেমন আছে, সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা খুব জরুরী।

এক হাজার বছর আগে আলবেরুনী এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম কালচারের প্রভেদের কথা বলেছিলেন। ১৯৩৫ সনে জওহরলাল নেহরু যে আত্মজীবনী প্রকাশ করেন, তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, মুসলমান এবং হিন্দু দুই ধরনের পাত্র ব্যবহার করেন। তার চল্লিশ দশকে লেখা ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া বইতে কালচার বলতে প্রাক-ইসলামী যুগের কালচারকেই বুঝিয়েছেন। ডঃ তারাচাঁদ হিন্দু সমাজের ওপর ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাবের কথা বলেছেন; দুই সংস্কৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে যাওয়ার কথা বলেননি। কিন্তু বাংলাদেশের সংস্কৃতি প্রসঙ্গ এলেই একদল মানুষ বাঙালি সংস্কৃতি নামক একপ্রকার মনগড়া সংস্কৃতির থিওরি আউড়ে বুঝাতে চান, বাংলায় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে চিরকাল একটা সাংস্কৃতিক ঐক্য, একটা জাতীয়তাবাদ বিরাজমান ছিল এবং '৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে সে ঐক্য বা জাতীয়তাবাদ বিনষ্ট হয়ে গেছে। এই চিন্তাধারার ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি আছে কি-না, সেটা ভেবে দেখা আশু প্রয়োজন। বিশেষ করে আমাদের যুবমানস যখন ক্রমাগত আত্মবিস্মৃত হয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতির দাস হয়ে পড়ছে, তখন নিজস্ব সংস্কৃতির রূপরেখা অন্বেষণ অত্যন্ত জরুরী অনুমিত হচ্ছে।

সংস্কৃতিকে সাধারণত দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি আদর্শিক সংস্কৃতি-অপরটি আদর্শহীন— শুধু স্থান বা জাতিভিত্তিক সংস্কৃতি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, জার্মান সংস্কৃতি একটি জাতিভিত্তিক সংস্কৃতি এবং ভারতীয় সংস্কৃতি স্থানভিত্তিক বা ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতি। আদর্শহীন সংস্কৃতির উৎস মানুষের মনগড়া জীবন দর্শন হওয়ায় সেগুলো নানাভাবে নানারূপে নানান সাজ-সজ্জায় বিভক্ত। এই ধরনের সংস্কৃতিতে জাতি কিংবা স্থানকেই সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়। ইসলামী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ইসলামী জীবনদর্শন এবং ইসলামী মানবতাবাদের ওপর ভিত্তি করে। ইসলামী সংস্কৃতি একটি আদর্শমূলক সংস্কৃতি। কাজেই ইসলামী সংস্কৃতির সাথে আদর্শহীন সংস্কৃতির পার্থক্য অনেক। জাতি, দেশ, বর্ণ, ভাষা ইসলামী সংস্কৃতির মূলভিত্তি নয়, ইসলামী সংস্কৃতির মূলভিত্তি তার ধর্মীয় জীবনদর্শন— যেমন আল্লাহর একত্ববাদ, রাসূল (সাঃ) এবং পরকালে বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। আল-কোরআনের মূল্যবোধই ইসলামী সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই ইসলামী সংস্কৃতি সর্বজনীন

www.icsbook.info

অর্থাৎ সব মানুষের সব দেশের সংস্কৃতি। আজকাল কিছু কিছু লোক ইসলামী সংস্কৃতিকে কূপমন্ডুক বা পিছিয়ে পড়া সংস্কৃতি বলতে চান, কিন্তু তা আদৌ সত্য নয়। কারণ একমাত্র ইসলামী সংস্কৃতিই সর্বদেশ-কাল-জাতির যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান, যা কিছু চিরন্তন, কল্যাণকর— সেগুলোই চয়ন করে এবং আত্তীকরণের মাধ্যমেই গড়ে উঠেছে। ইসলামী সংস্কৃতিই বিশ্বব্যাপী মুসলিম সংস্কৃতির সেতুবন্ধ রচনা করেছে। সুতরাং ইসলামী দর্শনের মূল্যবোধগুলোই ইসলামী সংস্কৃতি। অপরপক্ষে মূল্যবোধের স্বীকৃতি নেই এমন সংস্কৃতিই উপমহাদেশের অনৈসলামী সংস্কৃতি।

মূল্যবোধহীন সংস্কৃতি মানুষকে মদ্যপানে উৎসাহিত করে, যেখানে-সেখানে জৈবিক ক্ষুধা মিটাতে উৎসাহিত করে, লিঙ্গপূজা, যোনিপূজা করতে অনুপ্রাণিত করে। মূল্যবোধহীন সংস্কৃতির ফলে কিছু মানুষ 'দেবদাসী' প্রথা ও তাদের যৌবন প্রদর্শনরূপ নৃত্য, 'ভরত নাট্যম' কিংবা আদি রিপুর ইন্ধন যোগানো সাহিত্য, সংগীত, পেন্টিংসকে সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি জ্ঞান করে। দেবালয়ে যৌবন মদমত্তা 'দেবদাসী'র যৌনাচ্ছ্বাস ছাড়াও মন্দির বহির্গাত্রে চিত্রকলার নামে (পুরীর কোনারক মন্দির) নর-নারীর রতি সম্ভোগের বহুবিধ ক্রিয়াকৌশল উৎকীর্ণ করাকে ধর্মীয় অভিব্যক্তি জ্ঞান করে, কামসূত্রের মত যৌনরতি কৌশল শিক্ষার পুস্তক রচনাকে ঐতিহ্য জ্ঞান করে, সূর্য গ্রহণ উপলক্ষে নদীতে নর-নারীর সমবেত উলঙ্গ স্নানকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান জ্ঞান করে। এসব সংস্কৃতির সাথে ইসলামী সংস্কৃতির মূল্যবোধের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ইসলামী সংস্কৃতির মূলকথা— মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত' অর্থাৎ সৃষ্টির সেরা জীব, মানুষ পৃথিবীতে 'আল্লাহর খলীফা' অর্থাৎ প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করছে। কাজেই সবখানেই তার সৌন্দর্যবোধ থাকতে হবে, শৃঙ্খলা এবং সত্য-সুন্দরের বাঁধন থাকতে হবে। সমাজে অনাচার সৃষ্টিকারী কোন কাজ, যা অন্যান্য সংস্কৃতি পরোক্ষভাবে হলেও সমর্থন করেছে, ইসলামী সংস্কৃতি সেগুলো কখনও অনুমোদন করে না। ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তিই হলো ধর্মবোধ। ধর্মবোধ থেকে উৎসারিত যে জীবনচর্চা— যা মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদে, খানা-পিনায়, আচার-ব্যবহারে, পালা-পার্বণে, চিন্তা-কল্পনায় এমনকি রাজনৈতিক কর্মধারায় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে— সেটাই বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমানের বহুকালের সঞ্চিত সংস্কৃতি। চার্চে বা মন্দিরে এক রকম আর সামাজিক ব্যবহারে ভিন্ন জীবনদর্শন— তেমন সংস্কৃতিতে মুসলমানেরা বিশ্বাস করে না।

ইতিহাসের ধারাক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, এদেশের মুসলমানেরা দীর্ঘ ২১৪ বছর ধরে স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই করেছে, সেই লড়াই-এর সবটুকুই ছিল তাদের স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই। এসব লড়াই-এর অনুপ্রেরণা ছিল মুসলমানদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি এবং জীবন-চেতনা। ভারতের বহু-ঈশ্বরবাদ, সামাজিক বৈষম্য একমুখী কল্যাণের দর্শনের সঙ্গে এই অঞ্চলের মুসলমানদের একেশ্বরবাদ, সাম্য-ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক সুবিচার, ন্যায় ও কল্যাণবোধের সংস্কৃতির মিল ছিল না বলেই দেশ বিভাগের প্রয়োজন হয়েছিল।

www.icsbook.info

মুসলমানদের ভিন্ন আবাসভূমির প্রয়োজন হয়েছিল হিন্দু আর্য সভ্যতার মূল্যবোধের সঙ্গে ইসলামী মূল্যবোধের সংঘাতের জন্যই। আর্য সভ্যতার সামাজিক ভিত্তি ছিল বংশানুক্রমিক বর্ণবৈষম্য, গো-ব্রাহ্মণে বিশেষ ভক্তি। অন্যদিকে মুসলিম সভ্যতার ভিত্তিমূল ছিল সাম্য ও মানব-সমতা।

১৯০৬ সালের মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা, ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাব, ১৯৪৭-এ পাকিস্তান সৃষ্টি, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১-এর স্বাধীনতা-ইতিহাসের এই সুদীর্ঘ পথে এনিয়ে কোন বিতর্ক বা মতানৈক্য সৃষ্টি হয়নি। ১৯৭১-এর স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতির মৌল বিশ্বাস, আশা-আকাংখা, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি নিয়ে সর্ব প্রথম কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়। বাঙালী সংস্কৃতি বা জাতীয়তাবাদের একমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় ৭০ দশকের শেখ মুজিবুর রহমানের আন্দোলনের মধ্যে। এই দেশটা কোন দিনও স্বাধীন ছিল না। স্বাধীন দেশ না থাকলে জাতি গড়ে উঠতে পারে না। স্বাভাবিক নিয়মে বাঙালী নামে কোন জাতিসত্তাও কোনদিন গড়ে উঠেনি। এদেশের কিছু মানুষ বাংলায় কথা বলতো বিধায় তাদের বাঙালী বলা হতো। কিন্তু তারা পরিচিত ছিল বাঙালী হিন্দু এবং বাঙালী মুসলমান নামে। তাদের ভাষাগত মিল থাকলেও সামাজিকতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। এখানে দুটো প্যারালাল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। একটি হিন্দু এবং অন্যটি মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা। এই দুই সমাজ ব্যবস্থার মিলের চাইতে গরমিলই ছিল বেশী। পরস্পরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, আইনের উৎস, বৈবাহিক সম্পর্ক, নৈতিকতা এমনকি বসবাসের পাড়াও ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। মুসলমান বাঙালী সন্তান জন্মে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু শোনে, এক আল্লাহতে বিশ্বাস করে, পুরুষদের খাৎনা হয়, মসজিদে নামায পড়ে, মৃত্যু অন্তে কবরস্থ হয়। অপরপক্ষে হিন্দু বাঙালী সন্তান অচ্ছ্যুৎ হয়ে জন্মায়। তাদের পৈতে হয়, বহু দেবদেবীর উপাসনা করে, মৃত্যু অন্তে চিতায় জ্বালানো হয়। ঐতিহ্যের দিক থেকেও হিন্দু বাঙালীরা রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, সাবিত্রী, রামায়ণ, মহাভারতের কল্পনাকারী আর মুসলমানরা কোরআন, হাদীস, খাদিজা, হাজেরা, রহিমা, শরীয়তুল্লাহ, সিরাজুদ্দৌলা, তিতুমীর, চাঁদ সুলতানা প্রভৃতি থেকে রস গ্রহণ করে। সুতরাং দুই সম্প্রদায়ের ভাষা এক হলেও কৃষ্টি এবং ধর্ম কোনদিনও এক ছিল না। সামাজিক এই বিচ্ছিন্নতার দরুন বাঙালী নামের কোন কালচার বা সংস্কৃতি কোনদিনও গড়ে উঠতে পারেনি। অবিভক্ত বাংলায় যে কালচার ছিল তা প্রকৃত অর্থেই বাঙালী হিন্দু এবং বাঙালী মুসলমান কালচার ছিল। কালচারাল বৈষম্যের কারণেই পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনগোষ্ঠী ১৯৪৭ সালে বাঙলাকে দ্বিখন্ডিত করে ভারতীয় কালচারের সাথে মিশে গিয়েছিল।

কবি ইকবাল বলেছেন, "রাজনীতি নয়; ধর্মই শাসন করবে জগত। আর সে ধর্ম হবে ইসলাম। কারণ ইসলামে বর্ণ-বিদ্বেষ নেই, পুরোহিত প্রথা নেই। এই ধর্মে জীবনকে, জগতের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়নি। ইসলাম মানুষের কামনা-বাসনাকে স্বীকার করে কিন্তু বাড়িয়ে তুলতে চায় না। ইসলাম জীবনকে উপভোগ করতে বলে, কিন্তু

www.icsbook.info

ভোগবাদী হতে নিষেধ করে।" বিখ্যাত ভারতীয় রাজনীতিবিদ এম.এন রায় বলেছেন, "এক সময় ইসলামের সামাজিক কর্মসূচী ভারতীয় জনগণের সমর্থন পেয়েছিল, কারণ এ কর্মসূচীর দর্শনগত ভিত্তি হিন্দুদর্শন থেকে উন্নততর ছিল।"

দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ নামে পরিচিত বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে আজ ঘোলা পানির প্লাবন। বাঙালী সংস্কৃতি নামক বেনোপানি সমস্ত জাতির অস্তিত্বের গায়ে কাদা লেপে দিয়ে অতলে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। যা ছিল সুস্থ, যা ছিল সুন্দর, যা ছিল চিরন্তন— সেসব মূল্যবোধের রক্তে সর্বনাশা মহামারির বীজ ঢুকিয়ে দেওয়া ছাড়া যেন এই রূপ-রস, গন্ধ-বর্ণহীন বাঙালী সংস্কৃতির আর কোন কাজ নেই। বাঙালী সংস্কৃতির একমাত্র কাজ, অতীতের সব ভালকে চুরমার করে দিয়ে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানবগোষ্ঠীকে পরিচয়হীন করে তোলা। বাঙালী সংস্কৃতির ধুয়া তুলে বাংলাদেশের মানুষকে তার সনাতন ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলাই এ সংস্কৃতির উদ্দেশ্য। ভারতীয় ফরমুলা গলাধঃকরণ করে এক শ্রেণীর মানুষ বাঙালী সংস্কৃতির যে বিকাশ ঘটানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছেন, তা মানসিক গোলামী ছাড়া আর কিছু নয়। মানসিক গোলামীর কারণেই ইকবাল-নজরুলকে মাথার উপর থেকে সরিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মাথার ওপর বসানো হয়। মিলাদ শরীফ, মোনাজাত প্রভৃতি শুভকাজের চিরন্তন অভিব্যঞ্জনগুলো বাদ দিয়ে মঙ্গল প্রদীপ, শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ প্রভৃতি কালচার আমদানী করা হয়। নাটক, গান, নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে উত্তর ভারতের রামলীলা, সাঁওতাল পরগনার ঝুমুর ইত্যাদির আদল বা ছাঁদ ব্যবহার করা হয়। জাতীয় সংস্কৃতির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে মনসার গান, শিবের গাজন, ঢাকের বাদ্য, কাঁসার ঘন্টা, শঙ্খ, উলুধ্বনি প্রভৃতিকে আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করা হয়। পথে পথে মূর্তি নির্মাণ করে মসজিদ নগরীর গৌরব ম্লান করা হয়। এসবই মনোদাসত্বের অভিব্যক্তি। ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের বা সংস্কৃতির কথা বলে এক শ্রেণীর মানুষ এদেশের শিল্প সংস্কৃতিকে আর্য-মুম্বাইয়া মডেলে ব্যভিচারী শিল্প-সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করতে চাইছে। এদেশের বেশীর ভাগ সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র, পেন্টিং-এ সেক্স এবং ভায়োলেন্সের প্রকট বিস্তার তারই প্রমাণ। এসবই আদর্শহীন সংস্কৃতি চর্চার কুফল।

আমাদের মনে রাখতে হবে, উপমহাদেশের মুসলমানরা সংস্কৃতিগত বিভাজনের কারণে অস্পৃশ্য হয়ে বেঁচে থাকা পছন্দ করেনি বলেই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তীতে একই স্বাতন্ত্র্য চেতনা নিয়েই তারা বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের মানুষের ইসলামী চেতনাই বাংলাদেশকে ভারত থেকে আলাদা করে রেখেছে। ইসলামী চেতনা দুর্বল হয়ে পড়লে স্বাধীনতা-স্বাতন্ত্র্য বিলীন হয়ে যাবে। কাজেই বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বরূপ অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠা, জাতির অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এর রূপাবয়ব নির্মাণ অত্যন্ত জরুরী।

২৯.০৩.৯৮

www.icsbook.info

ধর্ম-রাজনীতি-সংস্কৃতি

একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের খসড়া গঠনতন্ত্র নিয়ে আলোচনা চলছিল। গঠনতন্ত্রের একটা ধারায় 'মুসলিম' ও 'ইসলাম' শব্দ দুটি এসে পড়ায় জনৈক সদস্য উদ্বাহু হয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন— গঠনতন্ত্র থেকে 'মুসলিম' ও 'ইসলাম' এই শব্দ দুটি বাদ দেওয়া হোক। কারণ জানিয়ে বললেন, "কোন রাষ্ট্রের কোন সংগঠনে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় শব্দ সম্বলিত গঠনতন্ত্র অনভিপ্রেত।"

জনৈক সদস্য মন্তব্য করলেন, "স্বাধীন রাষ্ট্রের' অন্য কোন সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় শব্দ অনভিপ্রেত কিনা জানি না, তবে স্বাধীনতার পর থেকে দেখে আসছি, কোন কোন মহলের কাছে 'মুসলিম' ও 'ইসলাম' শব্দ দুটিই বড় অনভিপ্রেত। যে কারণে 'কুমুদিনী', 'জগন্নাথ', 'কার্জন', 'সেন্ট যোশেফ' ইত্যাদি নাম যথাস্থানে বহাল থাকলেও 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হল' থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রয়োজন পড়েছিল, 'নজরুল ইসলাম' কলেজ থেকে হাস্যাস্পদভাবে 'ইসলাম' শব্দটি ছেঁটে দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় মনোগ্রাম থেকে কোরআনের আয়াত মুছে ফেলার প্রয়োজন হয়েছিল।

বর্তমান প্রেক্ষাপট একটু ভিন্ন। এখন সরাসরি 'মুসলিম', 'ইসলাম' বাতিল করার কথা না বলে একটু ঘুরিয়ে নাক দেখানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, রাজনীতি থেকে ধর্মকে বাতিল কর। সংস্কৃতি থেকে ধর্মকে বাতিল কর। শিক্ষা থেকে ধর্মকে বাতিল কর।

সেদিন দেখলাম, দেশের ভিত্ গড়ার কারিগর বলে পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবীতে মিছিলে নেমেছেন।

জাতির বিবেক বলে পরিচিত কিছু বুদ্ধিজীবী আল্লাহ, রাসূল (সাঃ), কোরআন, মসজিদ, আজান, ধর্মীয় মূল্যবোধ, দাড়ি, টুপি ইত্যাদিকে নিয়ে এমন হাসি, মস্করা, ঠাট্টা, তামাশার নাটক, কবিতা, গল্প ইত্যাদি লিখছেন এবং বক্তৃতা-বিবৃতিতে এমন বিষোদগার করছেন যে, এ যুগের শয়তান সালমান রুশদীও লজ্জা পেয়ে যাচ্ছে।

কিছু রাজনৈতিক দল এবং তাদের 'নির্মূল' সংগঠন তো ধর্মের নামে ইসলাম নির্মূলে আজন্ম 'মা কালীর খড়গ' উঁচিয়েই আছেন। এদেরই উৎসাহে দেশের মুষ্টিমেয় জনসমষ্টির কয়েকজন স্বঘোষিত নেতা 'বসনিয়ান' কায়দায় 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বাতিলের বায়না ধরেছেন। প্রয়োজন হলে 'বসনিয়ার মত' পাশের দেশ থেকে ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী এনে এদেশের জনগোষ্ঠীকে শায়েস্তা করারও হুমকি দিচ্ছেন— তবু আমরা অচেতন। ভূতের মন্ত্রের মত তাদের শেখান ধর্মনিরপেক্ষ, সেক্যুলারিজমের বুলি আউড়ে চলেছি। যদি এ ধূনায় ঠাকুর তুষ্ট হন, এমন একটা ভাব।

ধর্মনিরপেক্ষ, সেক্যুলারিজমের চ্যালারা বলছেন, ধর্মের নামে দেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান হয়েছিল। ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। ধর্মের নামে খুন-জখম চলছে। ধর্মই ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিগত ও সামাজিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মের নামে নিরীহ মানুষের হত্যাকান্ড ঘটে চলেছে। ধর্মের নামে দেশে গৃহযুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে।

www.icsbook.info

সুতরাং ধর্মকে মুষ্টিমেয় ধর্ম প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ করতে হবে। তাই ওদের দাবী ধর্ম বিশ্বাসকে রাজনীতি, রাষ্ট্র শাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি থেকে উৎখাত করে সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ বা 'সেক্যুলারিজমের' সুবাতাস বইয়ে দিতে হবে!

এই 'ধর্মনিরপেক্ষ' বা 'সেক্যুলারিজম' কথা দুটোর অর্থ কি? অভিধান ঘেঁটে দেখলাম, 'নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থ নিরঃ (নাই)+ অপেক্ষা যার। অর্থাৎ অপেক্ষা রহিত বা প্রয়োজন রহিত। তাহলে 'ধর্মনিরপক্ষে রাষ্ট্রের' অর্থ দাঁড়াল, ধর্মের প্রয়োজন রহিত রাষ্ট্র। আবার ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে ইংরেজীতে বলা হচ্ছে 'সেক্যুলার স্টেট' যার বাংলা হলো 'লোকায়ত রাষ্ট্র'। অভিধান অনুসারে 'লোকায়ত' শব্দের অর্থ 'চার্বাক' মতাবলম্বী, এথিস্ট বা নাস্তিক। তাহলে 'সেক্যুলার স্টেট' বলতে তো বুঝায় নাস্তিক্যবাদী রাষ্ট্র। যারা ধর্মনিরপেক্ষ বা নাস্তিক্যবাদী রাষ্ট্র চাইছেন, তারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন নব্বই ভাগ তাওহীদবাদী মুসলমানের দেশে নাস্তিক্যবাদী সরকার বা রাষ্ট্র সম্ভব কি-না?

এখন দেখি রাজনীতি কি? রাজনীতি শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে পাওয়া 'পলিটিক্স' শব্দটিরই বঙ্গানুবাদ। গ্রীক 'পলিস' শব্দ থেকে পলিটিক্সের উৎপত্তি। 'পলিস' শব্দটির অর্থ গ্রামগোষ্ঠী, নগর বা সমাজ, যেখানে মানুষ যৌথভাবে বসবাস করে। পশু দলবদ্ধ জীব, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। এরিস্টটল তাই দেখলেন মানুষের সমাজে কিছু সর্বজনমান্য আচরণবিধি বা নিয়মনীতি থাকা প্রয়োজন। নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন সমাজে মনুষ্যত্বের হানি হয়। সুতরাং নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ে সমাজ পরিচালনার জন্যই পলিটিক্সের উৎপত্তি। সমাজ বিজ্ঞানী 'বের্লিন' পলিটিক্স শব্দ ব্যাখ্যা করে বলেছেন— 'দ্যা আর্টস অব লিভিং ইন এ পলিস'। অর্থাৎ সমাজে সুশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন পদ্ধতি বা আর্টের নামই পলিটিক্স বা রাজনীতি।

এই সুশৃঙ্খল আর্টের উৎপত্তিই ধর্ম থেকে। ধর্ম মানে আল্লাহর প্রতি মানুষের এবং মানুষের প্রতি মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, সেগুলো অবহিত হওয়া, স্বীকার করা ও সম্পাদন করা। অর্থাৎ আল্লাহর হক্ এবং বান্দার হক্ আদায় করার নামই ধর্ম। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "ধর্ম লোক সকলকে ধারণ বা রক্ষা করে এই জন্যই ধর্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয় উহাই ধর্ম।"

মানুষের রক্তের হেমোগ্লোবিনে পাকাপাকি ভাবে বাসা বেঁধেছে যে বস্তুটি, তার নাম লোভ। 'আরও দাও' 'আরও চাই', এই আকাংখাগুলোকে বশে আনা কোন তন্ত্র-মন্ত্রের কাজ নয়। ষড়রিপুকে বশ করতে হলে চাই ধর্মীয় চেতনা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা এবং আত্মিক উন্নতির শিক্ষা। ধর্মই শিক্ষা দেয় অল্পে তুষ্টি, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, শোকর-গুজারি, কৃতজ্ঞতা, কোমলতা, সহানুভূতি, চারিত্রিক পবিত্রতা, লজ্জাশীলতা, বদান্যতা, সাহসিকতা, বীরত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ, পুণ্যশীলতা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি মানবিক সদ্‌গুণাবলী। ধর্মই মানুষকে মহত্ত্বের উৎসের দিকে আহ্বান করে সুখী, সুন্দর, সুশৃংখল জীবন গড়ার পথ দেখায়।

আজ যখন নাস্তিকতাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, ভোগবাদিতার পাঁকে পড়ে মানুষ বেপরোয়া, ভোগবিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল, শেকড়হীন পরগাছা, বাঁধনহীন জীবনযাপনের দিকে এগিয়ে

www.icsbook.info

যাচ্ছে, দেশ দুর্নীতিতে ভরে উঠছে, শিক্ষাঙ্গন চরিত্র হারাচ্ছে, তরুণ সমাজ চরম নৈতিক অবক্ষয়ে গা ভাসিয়ে সমাজের আতংকে পরিণত হচ্ছে। আজ যখন চুরি, ঘুষ, ছিনতাই, রাহাজানি, চোরাচালান, সোনা পাচার, মাদকাসক্তি দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছে, নৈতিক অবক্ষয়ে দেশ যখন তলিয়ে যাচ্ছে, পাশবিকতার মুখে লাগাম এঁটে দেবার জন্য যখন ধর্মের বিশেষ প্রয়োজন, তখন ধর্মের পথকে রুদ্ধ করার কথা বলা হচ্ছে। ধর্মকে জীবন থেকে বিতাড়িত করে, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি থেকে উচ্ছেদ করে মসজিদে আবদ্ধ করার কথা বলা হচ্ছে। তারা একবারও ভেবে দেখছেন না ধর্মের পথ রুদ্ধ করার অর্থ সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া, যার পরিণাম মারাত্মক হতে বাধ্য।

পৃথিবীতে নাস্তিকতাবাদ যখন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিনের মূর্তি যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছে, ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ এঁটে ভারত যখন বাবরী মসজিদ ধ্বংস করছে, ধর্মনিরপেক্ষতার লেবাস পরে যখন প্যালেস্টাইনে, কাশ্মীরে, বসনিয়ায় গণহত্যা চলছে, তখন আমাদের দেশের একদল মগজ-বেচা বুদ্ধিজীবী ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার মধ্যে সব সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করছেন। মুসলমানরা মনে করে ইসলাম কোন ধর্ম মাত্র নয়। ইসলাম একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামে আধ্যাত্মিক বা জাগতিক বলে দুটো ভিন্ন ক্ষেত্র নেই, ইসলাম ধর্মনীতিকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে দেখে না। কারণ, ইসলাম মনে করে ধর্মহীন রাজনীতি অমানবিক ও অর্থহীন। একজন মুসলমানের সংস্কৃতির ভিত্তিও হলো মানুষ সম্পর্কে এমন এক বিশ্বাস যা ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। মুসলমানের সংস্কৃতি হলো তার ধর্মের নির্যাস। ইসলামে সংস্কৃতি চিন্তা মানব চরিত্রের নিগূঢ়তা থেকে উৎসারিত। পক্ষান্তরে জড়বাদী সংস্কৃতি বাইরের জড়বাদী দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে উদ্ভূত কল্যাণ-অকল্যাণ চিন্তার ধারক। সে জন্যই মুসলমানের সংস্কৃতি আল্লাহ্ এবং বিবেকের কাছে দায়ী এবং জড়বাদী সংস্কৃতি বাইরের আইন-কানুনের ওপর নির্ভরশীল। যার ফাঁক-ফোকর আবিষ্কার সহজসাধ্য। যিনি শুধু ভাবের স্রোতেই গা ভাসিয়ে চলেন, তিনি তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির 'প্রাগম্যাটিস্ট'। ভাবমগ্ন আইডিয়ালিস্ট না হলে তার কাছে মানব সমাজের প্রত্যাশার কিছু থাকে না। ধর্মীয় সংস্কৃতি সমাজে আইডিয়ালিস্টের জন্ম দেয়।

আজ মনে রাখতে হবে ধর্মের প্রতি অনীহাই আমাদের আত্মিক বিষণ্ণতার কারণ। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, মূল্যবোধ চিরন্তন বিশ্বাসের স্তম্ভগুলোকে ধ্বংস করে ফেলার ফলেই জন্ম নিয়েছে বিকৃতি, আত্মিক সংকট। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মুসলমানের রাজনীতি চিরদিনই ধর্মের পথে, নৈতিকতার পথ ধরেই এগিয়ে এসেছে। সে পথে সে যুগে যেমন সাফল্য এসেছিল, এ যুগেও তেমনি সাফল্য আসতে বাধ্য।

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা নামে নাস্তিক্যবাদ, ভোগবাদের কথা বাতুলতা মাত্র। এখন জোর গলায় বলতে হবে যতই আমাকে ধনরত্ন দাও আমি ধর্মহীন শূকর হব না। কখনও দেহকে মনে করব না 'আমি', কোন কিছুর প্রলোভনেই মনষ্যত্বকে বিসর্জন দেব না। তাহলেই আমাদের শিক্ষা সার্থক হবে, আমরা প্রকৃত সংস্কৃতিবান হব। আমাদের পূর্ব পুরুষদের মত চরিত্রবান হব। দেশ জাতি সমৃদ্ধ হবে। ১৫.১০.৯৩

www.icsbook.info

আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

প্রথমেই দেখা যাক সংস্কৃতি কাকে বলে? সংস্কার কথাটা থেকেই সংস্কৃতি শব্দের উৎপত্তি। সংস্কার করা মানে শোধন করা, মার্জিত করা, উৎকর্ষ সাধন করা। সোজা কথায় বলা যেতে পারে, চিত্তের উৎকর্ষ সাধনই সংস্কৃতি এবং চিত্তের অপকর্ষ বা বিকৃতিই হলো অপসংস্কৃতি। একই ভাবে ইংরেজী 'কালচার' শব্দটিও এসেছে জার্মান CULTURA' শব্দ থেকে। Cultura শব্দের অর্থ কর্ষণ। কালচার হলো মানুষের নিবিড় সত্তার সারভাগ। কালচার শব্দটি প্রথম প্রবর্তন করেন বেকন্। ইংরেজীতে যাকে কালচার বলা হয়, তাকে উন্নত মানসিকতা সম্পন্ন মানুষই বুঝানো হয়। আর নিকৃষ্ট স্বভাবের মানুষকেই বলা হয় আনকালচার্ড। কালচারের সিঁড়িতে পা রেখেই আসে সভ্যতা বা সিভিলাইজেশন। সুতরাং কালচারড মানুষই সভ্য মানুষ, আনকালচারড বা দুষ্কৃতিপরায়ণ মানুষকে অসভ্য, বর্ব্বর বা আনসিভিলাইজড বলা হয়।

এখন দেখা যাক সংস্কৃতি অপসংস্কৃতির পার্থক্যটা সৃষ্টি হল কিভাবে। জন্ম সূত্রে অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষও একটা প্রাণী। বৈশিষ্ট্য হল মানুষের মন আছে, অন্যান্য প্রাণীর মন নেই। একমাত্র মানুষই 'সাইকো ফিজিক্যাল অর্গানিজম' অর্থাৎ মানুষই শরীর এবং মনের একটা সংগঠন। মানুষের মনে পাশবিক এবং মানবিক দু'ধরনেরই প্রবৃত্তি আছে। এক এক পরিবেশে এক এক প্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে। ভালো প্রবৃত্তি বিকাশের জন্য চাই সুস্থ জীবন প্রণালী, সুস্থ জীবনবোধ, সুস্থ সংস্কৃতি। বহুদিনের সংস্কারহীনতা বা শিক্ষাদীক্ষার অভাবে মানবিক গুণগুলো যখন চাপা পড়ে যায়, বা ধূলিমলিন হয়ে পড়ে, তখনই মানুষের মধ্যে পশুত্ব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মানুষ হয়ে ওঠে অসংস্কৃত, বা পাশবিক বৃত্তিসম্পন্ন বার্বেরিয়ান।

মানুষকে পশুত্বের দুর্দশা থেকে বাচাঁনোর জন্য পৃথিবীতে বহু সংস্কারকর্তা এসে মানবতার মাঠে সংস্কৃতির চাষ দিয়ে গেছেন। মানুষের ভিতরকার চাপাপড়া মানবিক গুণাবলী ঝাড়া-মোছা করে তাদের মনুষ্যত্বের বিভায় উদ্ভাসিত করে গেছেন। সেই সংস্কার বেশি দিন টেকেনি।

সর্বশেষ নবী এলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), যিনি সংগে নিয়ে এলেন অমূল্য সংস্কার-গ্রন্থ কোরআন, যা কেয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকার গ্যারান্টিসহ মানব কল্যাণের জন্য রেখে গেলেন। সেই মহান গ্রন্থ আল-কোরআন এবং সর্বশেষ নবীর নির্দেশিত জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে যে জীবনচর্চা, সেটাই বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মানুষের সংস্কৃতি। সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের মানুষের জন্য সৃষ্টি হয়েছে যে

www.icsbook.info

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যের ফলেই তারা শিখেছে ভাত সকলেই খায়, কিন্তু কলা পাতায় খাবে না প্লেটে খাবে? যেটি উত্তম সেটিই তার সংস্কৃতি। মানুষকে বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে আপ্যায়ন করবে, নাকি মানুষ বাড়িতে ঢুকলে হাঁড়ি-পাতিল ফেলে দিবে, কোন্‌টি উত্তম সেটাই তার সংস্কৃতি। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে মামী আপন ভাগ্নের প্রেমে বিহবল হয়ে মিলন কামনায় জর্জরিত চিত্তে গাইবে 'না পুছ না পুছ সখী শ্যাম পিরিত, পরান নিছনি দিলে না হয় উচিত, নাকি প্রেম কাব্যের নায়ক ফরহাদ নায়িকা শিরিকে পাওয়ার বাসনায় পাহাড় কাটার কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হবে, কোন্‌টা উত্তম? কোন্‌টা শোভন? সেটাই তাদের সংস্কৃতি।

ঐতিহাসিক টয়েনবি সাহেব বলেছিলেন, সংস্কৃতি বা কালচারের এক আবর্তিত চক্র থাকে। যেমন বর্তমান ইউরোপীয়ান কালচারের পিছনে আছে খৃস্টান কালচার। তারও পিছনে আছে গ্রীক বা রোমান কালচার। ইউরোপীয়ান কালচারকে বোঝা যাবে না, যদি আমরা গ্রীক বা রোমান কালচারকে বোঝার চেষ্টা না করি। তেমনি মুসলিম কালচারও সেই মদীনা থেকে আবির্ভূত হয়ে পৃথিবীর নানান দেশ ঘুরে বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং মুসলিম কালচারের পরিচয় খুঁজতে হলে মদীনার কালচারকে বুঝতে হবে।

পৃথিবীতে বহু সাংস্কৃতিক ধারা লক্ষ্য করা যায়। যত জাতি, যতগুলো জীবন দর্শন, ততগুলোই সংস্কৃতি। জীবন দর্শনের পার্থক্য হেতু সংস্কৃতির প্রকাশ ভঙ্গিমারও হেরফের ঘটে। বাংলাদেশে ৯০ ভাগ মুসলমানের আবাস, যাদের জীবন দর্শন তাওহীদ সঞ্জাত। যাদের মানসিকতা, হৃদয়বৃত্তি, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাংখা, সব কিছুই গড়ে উঠেছে আল্লাহর একত্ববাদের ভিত্তিতে। সুতরাং মুসলমানদের সংস্কৃতি আল্লাহর একত্ববাদ, পরকাল এবং রসূলে বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল।

উপমহাদেশে বিদ্যমান বহু অবতারবাদী জীবনদর্শন নিয়েও গড়ে উঠেছে আরও অনেকগুলো পৃথক পৃথক সংস্কৃতি। সেখানে লিঙ্গপূজা, যোনিপূজাকে পবিত্র জ্ঞান করা হয়। শিবলিঙ্গম, রামলিঙ্গম, বৃহৎ লিঙ্গম প্রভৃতি মনুষ্য নামকে পৌরুষের প্রতীক মনে করা হয়। পুরোহিত ব্রাহ্মণদের উপভোগের সামগ্রী যুবতী নারীদের দেবদাসী হওয়াকে পুণ্যাত্মা জ্ঞান করা হয়। ভারতের স্বনাম খ্যাত ভরত নাট্যম নৃত্য শিল্পী রুক্মিনী দেবী ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফীর সাথে এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'ভরত নাট্যম' নৃত্য আসলে ধর্মীয় বারবনিতা দেবদাসী'দের পূজারী মনোরঞ্জনের ছলা-কলা। সেই ভরত নাট্যম নৃত্যকে সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ মনে করা হয়। 'কামসূত্র'-এর মত যৌথ যৌনক্রিয়ার পুস্তক রচনাকে ঐতিহ্য মনে করা হয়। মদ্যপান বা সোমরস জাতীয় উত্তেজক পানীয়কে দেবতাদের পানীয় জ্ঞানে পূজার অঙ্গ মনে করা হয়। নরনারীর

www.icsbook.info

উলঙ্গ স্নানকে পুণ্যের কাজ মনে করা হয়। এসব সংস্কৃতির সাথে বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতির পার্থক্য প্রকট। জীবনদর্শনের এবং মূল্যবোধের এই পার্থক্যের কারণেই উপমহাদেশের মুসলমানদের আলাদা আবাসভূমির প্রয়োজন হয়েছিল।

দুঃখের বিষয় আজ বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বিজাতীয় সংস্কৃতির ছায়াপাত ঘটেছে।

দু'একটা উদাহরণ দিতে হলে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে কোন শুভ কাজ উদ্বোধন করা বা শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বাণ প্রভৃতি বিশ্বাসের কথা বলতে হয়। অগ্নি কালচারের সূত্র উৎসের সন্ধান করলে দেখা যায়, উপমহাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে অগ্নি প্রত্যক্ষ দেবতারূপী ভগবান। তাদের ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে বলা হয়েছে অগ্নি পার্থিব দেবতাদের মধ্যে প্রধান। অগ্নি দেবতা ও মানবের মধ্যস্থতাকারী। অগ্নি যজ্ঞ সারথি। ইনি নিজের রথে দেবতাদের বহন করে যজ্ঞস্থলে বা শুভকার্য স্থলে নিয়ে আসেন। হিন্দু সম্প্রদায় বিশ্বাস করেন অগ্নি ব্যতীত কোন দেবতা শুভকাজে উপস্থিত হতে পারে না। সেই জন্য তারা অগ্নিকে যজ্ঞ পুরোহিত বলেন। একই বিশ্বাসের দরুন হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, পূজা, পার্বণ সকল কাজেই অগ্নির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তারা মনে করেন অগ্নির রথে চড়ে দেবতা শুভ কাজে আবির্ভূত হবেন এবং তিনিই কাজটিতে মঙ্গল দান করবেন। গান্ধীজীর সমাধি মন্দিরে অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে ঠিক ঐ একই বিশ্বাসে। কিন্তু মুসলমানরা এক আল্লাহ-এর উপর নির্ভরশীল। তারা আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে না। কারও কাছে মঙ্গল প্রত্যাশীও নয়। মুসলমান যখন কোন কাজ শুরু করে, তখন আল্লাহর কাছে মোনাজাতের মাধ্যমেই শুরু করে। মঙ্গল প্রদীপ বা শিখা অনির্বাণ জাতীয় বিশ্বাস, যা আল্লাহকে ছোট করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তা কখনও মুসলমানদের কালচার হতে পারে না।

এছাড়া আরও কিছু উপমা উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমন যিনা বা ব্যভিচারকে ইসলামী আদর্শ শক্তভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছে। শুধু তাই নয়, ব্যভিচার ঘটাতে পারে এমন সব কার্যকারণ থেকেও দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন স্বল্প বসন পরা, নারী-পুরুষের অবাধ উন্মুক্ত মেলামেশা করা, নিভৃতে নারী-পুরুষের সাক্ষাৎ বা ডেটিং, অশ্লীল সাহিত্য বা পত্র-পত্রিকা পড়া, নগ্নছবি দেখা, উত্তেজক গান-বাজনা দেখা বা শোনা ইত্যাদি ব্যভিচারের কারণ ঘটাতে পারে বিধায়, ইসলামী সংস্কৃতিতে এগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের একশ্রেণীর মুসলমান নর-নারী পাশ্চাত্য বা বৈদান্তিক স্টাইলে, বৈশাখী মেলার নামে, বসন্ত বরণের নামে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নবীন বরণের নামে, থার্টি ফাস্ট ডিসেম্বরের নামে, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী যে ধরনের খোলামেলা, গলাগলি আচরণ করে, তাতে ব্যভিচারের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

www.icsbook.info

এইতো সেদিন ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ ক্রিকেট খেলতে আসা ভারতীয় ক্রিকেট তারকাকে, সুপার মার্কেটে একা পেয়ে ঢাকার যুবতী কন্যারা তার কাপড় টানাটানি করেছিল, গলার চেইন ছিঁড়ে নিয়েছিল। জনৈক মুসলিম ললনা পোস্টারে Mary-me লিখে ভরা স্টেডিয়ামে বসে পাকিস্তানী ক্রিকেট তারকাকে বিয়ের আকুতি জানাচ্ছিল। কোথায় বাঙালী ললনাদের সেই লজ্জার ভূষণ। থার্টিফাস্ট ডিসেম্বর নাইটে বড় বড় হোটেলগুলোতে পানউন্মত্ত নরনারীর বলড্যানস, বিবসনা হয়ে সারারাত পথে পথে যুবক-যুবতীদের হুল্লোড়, পটকাবাজী, উৎকট গান-বাজনা, গাড়ীর হর্ন বাজানো ইত্যাদি দেখে মনে হয় না বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি বিদ্যমান আছে।

বিসদৃশ সংস্কৃতির মিলনের কুফলও ফলতে শুরু করেছে। নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ প্রভৃতি সংবাদে প্রতিদিন পত্রিকার পাতা ভরে থাকে। মাদক আসক্তি, মাদক চোরাচালান দেশে ভয়াবহ রূপে বেড়ে গেছে। দেশে উচ্ছৃংখলতা বাড়ছে, অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে, এসবই মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কুফল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি একটাই। হয় সে আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশিত সংস্কৃতি অনুসরণ করবে, নয়তো কাফেরের দলে মিশে যাবে, এর কোন মধ্যপথ বা পন্থা নেই।

২৩.০২.৯৮

www.icsbook.info

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও ভাষা

আমার নানা বৃটিশবিরোধী আন্দোলন করে বহুবার জেল খেটেছিলেন। একবার তার জেলমুক্তি উপলক্ষে এক সংবর্ধনা সভায় কে একজন নানাকে 'সূর্যসন্তান' বলে সম্বোধন করেছিল বলে নানা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, "আমাকে গালি দেবার অধিকার আপনাদের নেই।" আমার আব্বা-আম্মা বর্তমান এবং তাঁরা সম্মানের সাথে স্ব-গৃহেই অবস্থান করছেন। সুতরাং আমি সূর্যসন্তান হতে যাব কোন্ দুঃখে?

চটে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করায় নানা বলেছিলেন, 'সূর্যসন্তান' কী, জানলে আমার সম্পর্কে ঐ সম্বোধনটি ব্যবহার করতিস না।

মহামুনি বেদব্যাস রচনা করেছিলেন 'মহাভারত'। সেই মহাভারতের একটা চরিত্র হচ্ছে রাজা 'পান্ডু'। ঋষির অভিশাপে রাজা পান্ডু সন্তান জন্মদানে অক্ষম হয়ে যান। তখন তিনি স্বীয় সুন্দরী স্ত্রী কুন্তী দেবীকে দেবরাজ ইন্দ্র ও পবন দেবের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করানোর অনুমতি প্রদান করেন। কুন্তী দেবীর গর্ভে জন্মায় যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব নামে পাঁচ পুত্র সন্তান। যারা 'পান্ডু'র পুত্র হিসেবেই পঞ্চপান্ডব নামে মহাভারতে খ্যাত হয়। এই পাঁচ পুত্র ছাড়াও কুন্তী দেবীর কুমারী অবস্থায় সূর্যদেবের সঙ্গে মিলনের ফলে আরও একটি পুত্র সন্তান জন্মায়, যাকে তিনি সমাজ ভয়ে জন্মলগ্নেই পরিত্যাগ করেন। পরে এই পুত্র এক সুতারের ঘরে মানুষ হয়েও স্বীয় প্রতিভা বলে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে এবং মহাবীর কর্ণ হিসেবে মহাভারতে খ্যাতি লাভ করে। কুমারী মাতার সন্তান 'কর্ণ' সূর্যদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করে মহাবীর হয়েছিলেন বলে বিশেষ কিছু মানুষ 'কর্ণের' বীরত্বগাথা স্মরণ করে বীর যোদ্ধাদের 'সূর্যসন্তান' বলে আখ্যায়িত করে থাকে। নানা আরও বললেন, তোরা আমাকে 'সূর্যসন্তান' বললি কোন্ সাহসে, আমি কি কুমারী মাতার সন্তান?

কিছু দিন আগে সংসদ ভবনের উত্তর প্লাজায় জাতীয় বীরদের পদক ও খেতাব বিতরণী অনুষ্ঠানে 'সূর্যসন্তান' কথাটির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা গেল। ধারা ভাষ্যকার জাতীয় বীরদের বারবার আখ্যায়িত করছিলেন 'সূর্যসন্তান' বলে। প্যান্ডেলে ঝোলানো ব্যানারগুলোতেও শোভা পাচ্ছিল 'বাংলার সূর্যসন্তানেরা....' ইত্যাদি লেখাগুলো। জানি না নানার মত কেউ প্রতিবাদ করেছিলেন কি-না, কিংবা প্রশংসার আড়ালে কুমারী পুত্রের নিন্দনীয় আখ্যা 'সূর্যসন্তান'কে সবাই গৌরব ভ্রমে মেনে নিয়েছিলেন।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে জাতিসত্তা লোপ পায়। আমিত্বকে মুছে দেয়, জাতিগত স্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করে পরমুখাপেক্ষী করে তোলে। ভাষা-সংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলেই আজ আমরা

www.icsbook.info

জাতীয় বীরদের 'মহাভারতীয়' কায়দায় 'সূর্যসন্তান' আখ্যায়িত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করছি। যেমন আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলাম ৭০ দশকে 'জয়বাংলা' শ্লোগানটি উচ্চারণ করে। আমরা কি জানতাম 'জয়' শব্দটি সংস্কৃত এবং এর আভিধানিক অর্থ বিজয় হলেও আসলে এই শব্দটি একটি ধর্মীয় পরিভাষা। আর্যরা মহাভারতের নাম দিয়েছিল 'জয়'। (কারণ তারা বিশ্বাস করতো মহাভারত পাঠ করলে অবিদ্যাজনিত সকল সংস্কার জয় করা যায়।) সুতরাং মহাভারতের অপর নাম 'জয়'। 'জয়' শব্দটি ধর্মীয় পরিভাষা হওয়ায় আর্যগণ তাদের ঠাকুর-দেবতা, দেশ, স্থান বা সম্মানিত ব্যক্তির আগে 'জয়' শব্দটি ব্যবহার করে তাকে মহিমান্বিত করতো। প্রেরণা লাভ করতো 'জয় মা কালী', 'জয় রামজি কি', 'জয় হিন্দ্', 'ভারত মাতা কি জয়', 'শিবাজি কি জয়' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করে। বিশেষ ধর্মীয় পরিভাষা হওয়ায় এদেশের মুসলমান ও বৌদ্ধগণ বরাবর 'জয়' শব্দটি প্রত্যাখ্যান করে এসেছিল। ৭০ দশকের শেষভাগে এসে মহাভারতের সেই 'জয়' শব্দটি হঠাৎ 'বাংলার' সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'জয় বাংলা'য় রূপান্তরিত হয়ে গেল। আমরাও অগ্র পশ্চাৎ না তাকিয়ে সেই শব্দটি উচ্চারণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে লাগলাম।

বাংলা আমাদের ভাষা, শুধু এই কথা বলে আত্মতৃপ্তি লাভ একটা স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক কারণে ভাষা-সংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলে এমন অনেক শব্দ আমরা আমাদের লেখায় ও দৈনন্দিন জীবন ব্যবস্থায় ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, যেগুলো সামগ্রিক ভাবে আমাদের ঐতিহ্য ও বিশ্বাসবিরোধী। যেমন, 'প্রয়াত' শব্দটির কথাই যদি ধরি। আজকাল শব্দটি যত্রতত্র ব্যবহার হচ্ছে। এইতো সেদিন বিপ্লব দিবসের এক অনুষ্ঠানে জাতীয়তাবাদী সামাজিক সংস্থার (জাসাস) এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বক্তব্য রাখতে গিয়ে সগর্বে বললেন, 'প্রয়াত জিয়াউর রহমান...'। মৃত ব্যক্তিকে 'প্রয়াত' বলার প্রচলন আছে, কিন্তু কাদের মধ্যে? 'প্রয়াত' মানে প্রস্থান করা বা চলিয়া যাওয়া। সব কিছু শেষ হয়ে যায়, মরণের পরে মানুষ চিরতরে চলে যায়- একথা মুসলমানরা বিশ্বাস করে না। মুসলমানরা পরলোকে বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করে মৃত্যুর পরই অনন্ত জীবনের শুরু। সুতরাং একজন মুসলমান প্রয়াত হয় না, সে ইন্তেকাল করে অর্থাৎ রূপান্তরিত হয়।

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'স্নাতক' এবং 'স্নাতোকোত্তর' কথা দুটো বহুল প্রচারিত। গ্রাজুয়েটদের 'স্নাতক' এবং পোস্ট গ্রাজুয়েটদের 'স্নাতকোত্তর' বলে আমরা সম্বোধন করছি। 'স্নাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'স্নান করিয়াছে এমন'। আর্যযুগে ছাত্ররা গুরুর আশ্রমে থেকে লেখাপড়া করত এবং শিক্ষা শেষ হলে গুরু শিষ্যটিকে ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্তিসূচক স্নান করিয়ে গলায় পৈতে পরিয়ে শিক্ষা সমাপনের স্বীকৃতি

www.icsbook.info

দিতেন। শিক্ষা শেষে স্নান এবং পৈতা পর্বটি অনুষ্ঠিত হত বলে এর নামকরণ করা হয়েছিল 'স্নাতকোত্তর'।

বাংলা ভাষার স্রষ্টা এবং বাংলা সাহিত্যের জনক মুসলমানরা হলেও রাজনৈতিক চক্রান্তের ফলে সে ভাষা মুসলমানদের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। উনিশ শতক থেকে বাংলা ভাষা হয়ে পড়ে পন্ডিতি ভাষা। আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি, ভাষার জন্য রক্ত ঝরিয়েছি, কিন্তু পন্ডিতি ভাষা আগ্রাসনের কবল থেকে বাংলা ভাষাকে মুক্ত করতে পারিনি। আজও আমাদের ভাষা, আমাদের সাহিত্য আপন দাওয়া-দহলিজের কথা ভুলে গিয়ে কলকাতার পন্ডিতদের ভাষায় কথা বলছে। তাইতো দেখি আমাদের টেলিভিশন 'খবরের' বদলে 'সংবাদ' পরিবেশন করছে। আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা খাওয়া ভুলে 'আহার' করছেন। 'বসা' ভুলে 'উপবেশন' করছেন। 'পরা' ভুলে 'পরিধান' করছেন, 'কলম' ভুলে 'লেখনী' তুলে নিচ্ছেন। তাদের 'লেখনী'তে 'তাজ' হচ্ছে 'মুকুট', 'তলওয়ার' হচ্ছে 'তরবারি', 'ঘোড়সওয়ার' হচ্ছে 'অশ্বারোহী', 'গোস্ত' হচ্ছে 'মাংস', 'পানি' হচ্ছে 'জল', 'খুন' বা 'লহু' হচ্ছে 'রক্ত'। তারা 'খানা' খেতে ভুলে গিয়ে 'আহার' গ্রহণ করছেন, 'গোসল' করতে ভুলে গিয়ে 'স্নানে' আনন্দ পাচ্ছেন। তাদের সাহিত্যে আমাদের গাঁও-গেরামের মা-বোনেরা 'পাকঘরে' বসে 'আন্ডার' 'সালুন' কিংবা 'গোস্তের' 'শুরুয়া' 'পাক' করে 'মেহমান' 'দাওয়াত' দিয়ে খাওয়ান না। বরং 'হেঁশেলে বসে 'ডিমের' 'ব্যঞ্জন' কিংবা 'মাংসের' 'ঝোল' 'রেঁধে' 'অতিথি' 'নিমন্ত্রণ' করে খাওয়াতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু পরের মুখে এ ঝোল খাওয়ায় পেট ভরবে তো?

"ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়", এ গান গেয়ে মুখের ভাষা যারা কেড়ে নিতে এসেছিল তাদের প্রতিরোধ করেছিলাম। কিন্তু যারা কেড়ে নিয়েছিল তাদের দিকে ফিরে তাকাবার অবসর পাইনি। গানটির পরের দুইটি চরণে বলা হয়েছে "কইতো যাহা আমার বাবায়/কইতো তাহা আমার দাদায়। এখন কওদেখি ভাই মোর মুখে কি অন্য কথা শোভা পায়।" এই লাইন দুটির তাৎপর্য সেদিনও যেমন উপলব্ধি করতে পারিনি আজও একচল্লিশ বছর পরেও পেরেছি বলে মনে হচ্ছে না।

মুসলমানরাই বাংলাভাষার নির্মাতা। উত্তর ভারতের মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ দান যেমন উর্দূ ভাষা, তেমনি বাংলার মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ দান বাংলা ভাষা। মুসলমানরাই এ দু'টি সমৃদ্ধিশালী ভাষার জনক। গৌড়ের মুসলমানরাই বাংলা ভাষাকে সাহিত্য পদ বাচ্য করে তোলেন। সুতরাং আমাদের বাপ-দাদারা যে বাংলা ভাষায় কথা বলতেন, তার একটা মুসলমানী রূপ অবশ্যই ছিল। এ সম্পর্কে হ্যালহেড সাহেব বলেছেন, "সে সময় আরবী-ফারসী মিশ্রিত বাংলা ভাষাই ছিল উৎকৃষ্ট খান্দানী ভাষা। সে সময় ঐ লোককেই

www.icsbook.info

শুদ্ধভাষী খান্দানী লোক বলা হত, যার ভাষায় প্রচুর পরিমাণে আরবী-ফারসী শব্দের মিশ্রণ থাকতো। সে সময় বাংলা ভাষার সারা গায়ে মুসলিম সংস্কৃতির ছাপ লেগেছিল। বিশেষ করে এই পূর্ববঙ্গের জনগণের ভাষার শতকরা ষাটটির মত ছিল আরবী-ফারসী শব্দ।" আজ কোথায় সেই ভাষা? আজ বাংলা ভাষায় মুসলিম ঐতিহ্যের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। বাংলা ভাষা থেকে সেই খান্দানী রূপটি মুছে ফেলে তাকে আর্য সংস্কৃতের কন্যা সাজানো হয়েছে। উনিশ শতক থেকে বিশ শতক-এর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা ভাষা তার মৌলিক রূপ হারিয়ে পন্ডিতি ভাষা হয়ে পড়ায় মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে দূরে সরে যায়। এ প্রসঙ্গে হ্যালহেড সাহেব বলেছেন, শুদ্ধ ও খান্দানী লোকদের ভাষাকে বাদ দিয়ে বাংলা গদ্যের রূপায়ণ ঐতিহ্যবিরোধী এবং ভাষার স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করেছিল। এই প্রয়াস সমসাময়িক মুসলিম বিদ্বেষী রাজনীতি থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই।"

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজদের নিকট মুসলমানরা শত্রু এবং হিন্দুরা সহযোগী মিত্র হিসাবে বিবেচিত হয়। ইংরেজ পাদ্রী উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান, ফরেস্টার প্রমুখের পরামর্শে বাংলা ভাষাকে 'যবন প্রভাবমুক্ত' বিশুদ্ধ সংস্কৃত কন্যা সাজাবার অভিপ্রায়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মৃত্যুঞ্জয়, তর্কালংকার, রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মা, চন্ডীচরণ মুন্সী প্রমুখ সংস্কৃত পন্ডিতগণ বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দ উৎখাত অভিযান শুরু করেন। তারা অপ্রচলিত সংস্কৃত প্রতিশব্দ সৃষ্টি করে ইংরেজদের অভিধান রচনায় সহায়তা করেন এবং নিজেরাও আরবী-ফারসী শব্দ বর্জিত লেখা প্রচার করতে থাকেন। এভাবেই ফিরিঙ্গী, কেরী, উড়িয়া, মৃত্যুঞ্জয়, তর্কালংকার এবং ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্রের হাতে পড়ে বাংলা ভাষা তার ঐতিহ্য হারিয়ে মুসলিম বিদ্বেষ প্রচারের হাতিয়ারে পরিণত হয়। বাপ-দাদার জবানের ভাষাকে বটতলার পুঁথি আখ্যা দিয়ে ঘৃণা ভরে দূরে ঠেলে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে ভাষা বিজ্ঞানী ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মন্তব্য করেছিলেন,"যদি পলাশীর ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত, তাহা হইলে এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।"

আজ বাংলা আমাদের রাষ্ট্র ভাষা। ভাষার জন্য আমরা জান কুরবানী করেছি শুধু একথা বলেই আত্মতৃপ্তি লাভ যথেষ্ট নয়। বাংলা ভাষার জন্ম যে গৌড় কেন্দ্রিক পূর্ববাংলায়, সেই পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জবানী ভাষা ঐতিহ্য চেতনা আজও আমাদের সাহিত্যে-গদ্যে অবহেলিত। আজও আমাদের সাহিত্যে, চিন্তায়, চরিত্রে, উপমায় রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষদের সুরই শুধু ঝংকৃত হয়। অফুরন্ত জ্ঞান ও শক্তির উৎস মহাবিশ্বের মহাগ্রন্থ আলকোরআন, হাদীস বা মুসলিম ইতিহাসের প্রেরণাশক্তি, মুসলিম ঐতিহ্যের শব্দ চয়ন আমাদের ভাষাকে সমৃদ্ধ, সাহিত্যকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান

www.icsbook.info

করতে পারেনি। আমাদের বাংলা ভাষাবিদ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তাব্যক্তিদের কাছে আজও আল্লাহ্, খোদা, রোজা, নামাজ, হজ্জ, যাকাত, ইবাদত, বন্দেগী, ওজু, গোসল, খানা, পানি ইত্যাদি শব্দগুলো বিদেশী শব্দজ্ঞানে পরিত্যাজ্য হয়ে আছে। অথচ এগুলোই বাংলার মেজরিটি মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক ভাষা। আমাদের সাহিত্যিক, সাংবাদিক বন্ধুগণও বেশ কিছু প্রচলিত আরবী-ফারসী জাত বাংলা শব্দ পরিহার করে পশ্চিমবঙ্গের 'আনন্দবাজার' 'দেশ' স্টাইলে তার সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহার করে অভিজাত হওয়ার চেষ্টা করছেন। যেমন কিছু শব্দের উদাহরণ দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। 'অকুস্থল' আরবী শব্দ বিধায় লেখা হচ্ছে দুর্ঘটনাস্থল। তেমনি 'আকছার' বাদ দিয়ে লেখা হচ্ছে 'সচরাচর', 'হুবহু' বাদ দিয়ে 'অবিকল', 'সামিল' বাদ দিয়ে 'অন্তর্ভুক্ত', 'খাসা' বাদ দিয়ে 'উৎকৃষ্ট', 'তুফান' বাদ দিয়ে 'প্লাবন', 'কবর' বাদ দিয়ে 'সমাধি', 'হপ্তা' বাদ দিয়ে 'সপ্তাহ', জিন্দাবাদ বাদ দিয়ে 'দীর্ঘজীবী', আখেরাত বাদ দিয়ে 'ভবিষ্যত', আজব বাদ দিয়ে 'বিস্ময়কর' আদত বাদ দিয়ে 'অভ্যাস', আলাদা বাদ দিয়ে 'পৃথক', ইস্তফা বাদ দিয়ে 'পদত্যাগ', ওয়াদা বাদ দিয়ে 'প্রতিশ্রুতি', লোবান বাদ দিয়ে 'ধুপধূনা', মেজাজ বাদ দিয়ে 'মানসিক অবস্থা', মাল্লা বাদ দিয়ে 'নাবিক', বায়না বাদ দিয়ে 'অগ্রিম', ফুরসত বাদ দিয়ে 'অবসর'। তেমনি ফারাসী শব্দজাত প্রচলিত বাংলা, যেমন- দরকারের বদলে 'আবশ্যক', দরজার বদলে দ্বার, দারওয়ানের বদলে প্রহরী, লাশের বদলে শবদেহ, পয়দার বদলে জন্ম, আজাদের বদলে স্বাধীন, আবাদ-এর বদলে চাষ, আন্দাজ-এর বদলে অনুমান, কিনার-এর বদলে তীর, খরিদ-এর বদলে ক্রয়, খানদান-এর বদলে বংশ, খুবসুরত-এর বদলে সুন্দর, খোশামোদ-এর বদলে তোষামোদ, গুনাহ্-এর বদলে পাপ, ঘিঞ্জি-এর বদলে সঙ্কীর্ণ, চাকর-এর বদলে ভৃত্য, চালাক-এর বদলে ধূর্ত, জলদির বদলে শীঘ্র, জান-এর বদলে প্রাণ, জানোয়ার-এর বদলে পশু, জোর-এর বদলে বল প্রয়োগ, তাজ-এর বদলে মুকুট, দরকার-এর বদলে প্রয়োজন, দরখাস্ত-এর বদলে আবেদনপত্র, দাওয়াত-এর বদলে নিমন্ত্রণ, দোয়ার বদলে আশীর্বাদ, পয়দা'র বদলে ভাবনা, পা-এর বদলে চরণ, বরখাস্ত-এর বদলে কর্মচ্যুত, বরাদ্দ-এর বদলে নির্ধারণ, বরাবর-এর বদলে চিরকাল, এমন আরও অনেক প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হলেও সাহিত্যে, সংবাদপত্রে ব্রাত্যজ্ঞানে পরিহার করা হচ্ছে। বিদ্যাসাগরের উত্তরসূরী আমাদের ভাষাবিদগণ পরিভাষা নির্ণয়ে এখনও সংস্কৃতের অভিধান তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাদের গবেষণায়'চ্যান্সেলর' হয়েছেন দেবপূজক পুরোহিতের আধার 'আচার্য'। ম্যানেজার হয়েছেন কর্মাধ্যক্ষ, আইন সভা হয়েছে বিধান সভা। কবি মুকুন্দরাম বা সত্যেনদত্ত রাজাকে রাষ্ট্রপতি বলেছেন। সুতরাং আমরাও প্রেসিডেন্টকে রাজ্যপতি বা রাষ্ট্রপতি বলছি। ভাইস চ্যান্সেলর যখন উপাচার্য হয়েছেন, তখন 'প্রভোস্ট' হয়তো অচিরেই 'প্রকোষ্ঠ ভট্টাচার্য' হবেন এমনটা

www.icsbook.info

আশা করা অমূলক নয়। ভাষার প্রাণরস নিহিত আছে জনগণের জীবনে। জনগণের জীবন ক্ষুধা মিটাতে পারে না এমন ভাষা দেশের মানুষের ভাষা হতে পারে না। তেমন সাহিত্য জাতীয় সাহিত্য হতে পারে না। আমাদের তরুণরা মায়ের ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল কিন্তু আমাদের ভাষাবিদরা পশ্চিমবঙ্গের বাংলার অন্ধ অনুকরণে মত্ত হয়ে নিজের মাটির ভাষাকে অশালীন ভালগারিটি জ্ঞানে বর্জন করতেও দ্বিধাবোধ করছেন না। ভাষা আগ্রাসনের ফলে আমরা ক্রমাগত পশ্চিম বাংলার কৃষ্টিক উপনিবেশ, ভাষিক সীমান্ত এবং সাহিত্যের বাজারে পরিণত হচ্ছি। ভাষা আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণে ব্যর্থ হচ্ছে। তবু আমরা বেহুঁশ বেখবর। নিজের দিকে ফিরে তাকাচ্ছি না। যেমন ধরা যাক— দেশের একটি মডেল টাউনের এবং একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকের নাম 'উত্তরা'। 'উত্তরা' মহাভারতে বর্ণিত মৎস্য রাজ বিরাটের স্ত্রী সুদেষ্ণার কন্যার নাম। পান্ডবরা যখন অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, তখন অর্জুন ক্লীব বৃহনালা সেজে উত্তরাকে নাচগান শেখাতেন। এক যুদ্ধের ময়দানে বিরাট রাজা অর্জুনের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে তার সঙ্গে কন্যা উত্তরার বিয়ে দিতে চান। কিন্তু অর্জুন মেয়ের বয়সী উত্তরাকে বিয়ে না করে পুত্র অভিমন্যুর সঙ্গে তার বিয়ে দেন। মহাভারতের সেই 'উত্তরার' নামে একটা ব্যাংক এবং একটা মডেল টাউনের নামকরণ করা হয়েছে। সত্যই মহাভারতের কথা শুন পুণ্যবান।

আজকাল 'গণ' শব্দটি শতমুখে প্রচারিত। 'আম জমায়েত' না বলে প্রায় সবাই বলছেন 'গণজমায়েত'। হিন্দুশাস্ত্রে শিবের ভৃত্য কিংবা শিবপার্বতীর অনুচরগণকে গণ বলা হয়। এই 'গণ'রা সবসময় শিব ও গণেশের কঠোর শাসনে থাকত। অন্যায় আচরণ করলে গণদের কৈলাস থেকে পৃথিবীতে নির্বাসিত করা হত। গণদের স্থান ছিল দেবতাদের চেয়ে নীচুতে। অতএব, আমাদের দেশের গণেশের অনুচরদের গণ নাম সার্থক হয়েছে বৈকি।

'তিলোত্তমা' শব্দটিও বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত শব্দ। 'নগরপাল'রা প্রায় সময়ই ঢাকাকে তিলোত্তমা করে গড়তে চাইতেন। সেই 'তিলোত্তমা' শব্দটির উৎস সন্ধান করা যাক।

দৈত্যরাজ নিকুম্ভের দুই পুত্র 'সুন্দ' ও 'উপসুন্দ'। ব্রহ্মার কঠোর তপস্যা করে অমরত্ব প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা তাদের অমরত্ব বর দেন না, তবে বলেন, স্থাবর জংগমে কোন প্রাণীর হাতেই তাদের মৃত্যু হবে না। যদি মৃত্যু হয় পরস্পরের হাতেই হবে। এই বর পেয়েই সুন্দ, উপসুন্দ দেবতাদের পীড়ন করতে শুরু করল। পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে দেবতারা ব্রহ্মার স্মরণাপন্ন হলেন। দেবতাদের অনুরোধে ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে এক সুন্দরী নারী সৃষ্টি করতে বললেন। ত্রিভুবনের সমস্ত উত্তম জিনিস তিলতিল করে সংগ্রহ করে বিশ্বকর্মা এমন এক অতুলনীয়া নারী সৃষ্টি করলেন যে, তাকে দেখবার আশায় স্বয়ং

www.icsbook.info

ব্রহ্মারই চারদিকে চারটি মুখ সৃষ্টি হল, দেবরাজ ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু সৃষ্টি হল। সুন্দ-উপসুন্দকে প্রলুব্ধ করার জন্য ব্রহ্মা সেই সুন্দরী নারীকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিলোত্তমা এসে সুন্দ- উপসুন্দের সামনে নৃত্য করতে শুরু করল। সুন্দ-উপসুন্দ তিলোত্তমার রূপে মুগ্ধ হয়ে উভয়েই তাকে পাবার জন্য যুদ্ধ আরম্ভ করে দিল এবং একে অপরকে নিহত করল। ঢাকা তিলোত্তমা হলে সুন্দ-উপসুন্দরা আবার একে পাওয়ার জন্য পরস্পর যুদ্ধ ঘোষণা করবে না তো?

বড় বেশী দেরী হয়ে গেছে। আজও যদি আমরা ভাষা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সতর্ক না হই, তা হলে আমাদের ব্যক্তিত্ব, স্বকীয়তা ও আত্মা বিজাতীয় ধর্ম, কালচারের হাতে বাঁধা পড়ে জাতীয় স্বকীয়তা খুইয়ে ফেলবে। পশ্চিমবংগের 'আনন্দবাজার', 'দেশ' পত্রিকার ভাষা যদি আমাদের আদর্শ হয়, তাদের বিকৃতি, শ্রুতিকটুতা, অশ্লীল পৌরাণিক উপমা, অপভ্রংশ যদি আমাদের কাছে ভাষার সৌন্দর্য অলংকার জ্ঞানে বরণীয় হয়, পক্ষান্তরে আমাদের জনগণের ভাষা-উপমা যদি অভদ্র, গেঁয়ো, সাম্প্রদায়িক জ্ঞানে বর্জিত হয়, তাহলে স্বাধীন জাতিসত্তা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানোর সব চেষ্টা, সব আস্ফালন বৃথায় পর্যবসিত হবে। সুতরাং আজ চাই দৃষ্টির স্বচ্ছতা, চিন্তার সবলতা, স্বাধীন চিত্তবৃত্তির বিকাশ, অতীতের সব ভুল শুধরে এগিয়ে চলার দৃঢ় সংকল্প। চাই স্বাধীন জাতি হিসাবে বেঁচে থাকার, নতুন পথে পা বাড়াবার সাহস। যে সাহসে বুক বেঁধে, সব বাধা-বন্ধন উপেক্ষা করে আমাদের জাতীয় কবি ডাক দিয়ে বলেছিলেন ঃ

"খালেদ! খালেদ! ফজর হয়েছে আযান দিতেছে কওম
ঐ শোন, শোন, আসসালাতু খায়রুম মিনান্নাওম।"

সাত সাগরের মাঝি ফররুখ যে ভাষায় জাতিকে পারের সন্ধান দিয়ে বলেছিলেন ঃ

"ভেঙ্গে ফেল আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙ্গছে বালুর বাঁধ।
ছিঁড়ে ফেলো আজ আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও হে মাঝি সিন্দাবাদ।"

এ ভাষাতেই বুকের রক্ত নেচে ওঠে, শির-দাঁড়া খাড়া হয়, হেঁট মাথা উঁচু হয়। এ ভাষাই আমাদের জবানি ভাষা, এ ভাষাই প্রাণের ভাষা, ঐতিহ্যের ভাষা। এ ভাষাই আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের মনে রাখতে হবে মানুষের সবচেয়ে বড় আত্মরক্ষা হল আপন জাতিসত্তাকে রক্ষা করা।

১৯.০২.৯৩

www.icsbook.info

গণমাধ্যম এখন গণবশীকরণে তৎপর

'৭৫-পূর্ব গণধিকৃত ও প্রত্যাখ্যাত সাংস্কৃতিক আবহকে জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস আবার জোরেশোরে শুরু হয়েছে। জনগণের পয়সায় লালিত টেলিভিশন খুললেই অষ্টপ্রহর একটা বিশেষ পরিবারের গুণকীর্তন এবং তার সাথে রবীন্দ্র, মাইকেল, বঙ্কিম, সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, মুকুন্দ দাস, দেবগৌড়, জ্যোতিবসুর অষ্টমঙ্গল নান্দীপাঠ শোনা যাচ্ছে। অন্যদিকে দেশের বর্ডার খুলে দেওয়া হয়েছে ভারতীয় নাচিয়ে গাইয়েদের জন্য। তারা আসছে, দলে দলে। নাচছে, গাইছে, মহাভারতের কথামৃত শোনাচ্ছে, দুদেশকে এক করার নোসখা বাতলাচ্ছে, গালিগালাজ করছে, লাথিও মারছে। আমাদের কর্তাব্যক্তিরা দন্ত বিগলিত হাস্য হেসে বলছেন- আহা লাথি মেরেছে মারুক, ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। ডিএল রায়ের গানের কলি আউড়ে বলছেন ঃ প্রভু অনুগ্রহ করে পৃষ্ঠেতো মেরেছো লাথি, মারো দেখি পুরো ভাগে। দেখি সেটা কেমন লাগে।

স্বাধীনতা একটা জাতিকে বিশাল হয়ে উঠতে সাহায্য করে। আমাদের স্বাধীনতার পঁচিশটা বছর চলে গেল, অথচ আমরা বড় হতে পারলাম না কেন? আমরা স্বাধীন জাতি হয়েও হাজার বছরের পরাধীন গোলাম, মাড়োয়ারীর শাসন-শোষণে ক্লিষ্ট ওপারের বাঙালি বাবুদের কৃশ পায়ের লাথি খেয়ে ধন্য হচ্ছি কেন, সেটাই কৌতূহলের বিষয়। আমাদের বড় মেজো সেঝোরা ঐ লাথিঝাঁটা খাওয়াকে এবং জারজ শব্দের গালি-গালাজকে এমন দেহাবরণ এবং কর্ণাভরণ জ্ঞান করছেন কেন সেটাই আজ বিস্ময়ের কারণ! বিস্ময়ের কিছু নেই! কারণ—

"প্রিয়ার হাতের কিলটিতে
মিষ্টি যেন গিঁটে গিঁটে
প্রিয়ার হাতের চাপড়গুলো
আহা যেন পুলিপিঠে
প্রিয়ার হাতের সবই মিঠে।"

বাংলাদেশ এক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে বসবাসকারী সংখ্যাগুরু মানুষের আশা- আকাংখা প্রতিফলিত হবে যে সংস্কৃতিতে, সেটাই বাংলাদেশের সংস্কৃতি। অথচ আমাদের প্রচার মাধ্যমগুলো, বিশেষ করে বোকার বাক্স টেলিভিশন, রাতদিন ঢোল-ঢক্কর পিটিয়ে জানান দিচ্ছে ওরা বাঙালি আমরাও বাঙালি, ওদের ভাষা বাংলা, আমাদেরও বাংলা। সুতরাং ওদের সাথে বর্ডার চেকপোস্ট ছাড়া আমাদের আর কোন পার্থক্য নেই। অতএব, এটা বাংলাদেশ হলেও সংস্কৃতি এক।

www.icsbook.info

কিন্তু সত্যিই কি তাই? ওদের সাথে আমাদের কি শুধু বর্ডারের পার্থক্য? ওদেরই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৯ সালে লিখিত 'ভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন- "বাংলাদেশের ইতিহাস খন্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ,পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ়-বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের নয়, অন্তরেরও ভাগ। সমাজেরও মিল নাই। এতকাল যে আমাদের বাঙ্গালি বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি বলে।"

ভাষা এক হলে- জাতিসত্তা আলাদা হতে পারে না, একথা যারা গদগদ কণ্ঠে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন, তারা ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড কিংবা সৌদি আরব, মিসর, ইরাক, কুয়েতকে এক রাষ্ট্র করে ফেলার আন্দোলনেও নামতে পারেন। কারণ এই রাষ্ট্রগুলোরতো ভাষাগত বিভেদ নেই। সবার ভাষাইতো ইংরেজী না হয় আরবী। সুতরাং এরাই বা আলাদা রাষ্ট্রে থাকবে কেন?

ওরা আরো একটা কথা জোরেশোরে প্রচার করছেন— সেটা হলো, "ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছিল বলেই নাকি পাকিস্তান টেকেনি। তাহলে তো প্রশ্ন করতে হয়, উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতের সঙ্গে পশ্চিম ভারতের মারাঠারা টিকে আছে কি করে? দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়দের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা একই রাষ্ট্র কাঠামোর আওতায় বাস করছে কি করে? তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের বন্ধন ছাড়াতো আচার, ব্যবহার, আহার, পোশাক, সংস্কৃতিতে কোন মিলই নেই।

আজকাল কেউ কেউ বাঙালির খাবার 'সুক্তো' খেতে ভুলে গেছেন বলে হা-পিত্যেশ করে গান বাঁধছেন। কেউ কেউ আবার শিকড়ে ফিরে যাবার বাসনায় মনসার গান, রামলীলা, ঢাকের বাদ্য, শঙ্খধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন না বলে, হায়- আফসোস করে মাথা থাবড়াচ্ছেন। কিন্তু তারা ভেবে দেখছেন কি শিকড়ে ফিরে যেতে হলে তো তাদের সিদ্ধ খেতে হবে। পিয়াজ, রসুন, এলাচি, দারুচিনি অশুচি হয়ে যাবে। সেলাইবিহীন দুখন্ড কাপড় গায়ে জড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করতে হবে। কাগজ ফেলে দিয়ে ভূর্জ্যপত্রে লেখাপড়া করতে হবে। সমাজে আবার নরবলি, শিশুবলি, সতীদাহ প্রথা চালু করতে হবে এবং যারা শেখ, সৈয়দ, খান, চৌধুরী প্রভৃতি মুসলিম টাইটেল গলায় লাগিয়ে জাতে উঠে সমাজের উঁচু স্তরে বসে আছেন, তাদের আবার অন্ত্যজ্য অস্পৃশ্যদের দলে নেমে যেতে হবে। শুধু সুক্তো খেলেই কি বাঙালি হওয়া যাবে? তার সাথে নাম পাল্টে গো-চোনা, গো-ময় খেয়েও যে পরিশুদ্ধ হতে হবে। সেই ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে না কেন!

আসলে ওরা জ্ঞানপাপী। বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা বলে ওরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কথাই শোনাচ্ছেন। বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলে বাংলাদেশের মানচিত্র পাল্টে ফেলে ওরা বাংলাদেশের সীমা-সরহদ মুছে দিতে চাইছেন। বাংলাদেশের জাতীয়

www.icsbook.info

আত্মার সাথে ওদের কিছুমাত্র পরিচয় থাকলে ওরা দেখতে পেতেন ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল হিন্দু আর্যসভ্যতার মূল্যবোধের সঙ্গে মুসলিম সভ্যতার মূল্যবোধের সংঘাতের ফলে। মুসলমানরা এই উপমহাদেশে অস্পৃশ্য হয়ে উপজাতির মত বাঁচতে চায়নি বলেই ১৯৪৭ সালে সমবেতভাবে তারা পাকিস্তানে যোগ দেবার জন্য আইন সভায় ভোট দিয়েছিল। আবার সেই একই স্বাতন্ত্র্য চেতনা নিয়েই বাঙালি মুসলমানরা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছিল। ১৯৩০ সালে কলকাতা করপোরেশনের এক সভায় শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক এ সত্যের প্রতিধ্বনি করে বলেছিলেন, "ভারতের ৭ কোটি মুসলমানের মধ্যে ৭০ জনও কংগ্রেসের সমর্থক নয়।" কারণ কংগ্রেসের বর্ণ, জাতি-বৈষম্য, গো-ব্রাহ্মণে বিশেষ ভক্তি, প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতা মুসলমানদের ক্ষুব্ধ-পীড়িত করেছিল।

ইতিহাস চর্চা এক সময় একাডেমিসিয়ানদের হাতে ছিল। তাদের হাতেই ইতিহাস গবেষণার ভার ছেড়ে দেওয়া হত। আজ একাডেমিসিয়ানদের বাদ দিয়ে কিছু মতলববাজ রাজনীতিবিদ ইতিহাস চর্চার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। যার ফলে পদে পদে ঘটছে ইতিহাস বিকৃতি। পুরোনো ইতিহাসের পাতা খুলে জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে। নতুন করে ইতিহাস নামের কল্পকথা লিখে গোটা জাতিকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। জাতিকে আজ শুনতে হচ্ছে "আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন ক্ষুদিরাম থেকে শুরু এবং শেখ মুজিবে এসে শেষ।" তাহলে ১৭৫৭-এর পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৭৩-এর ফকীর বিদ্রোহ, ১৮০৪-এ হাজী শরীয়তুল্লাহর বিপ্লব, ১৮২০-৩১ পর্যন্ত সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর বিপ্লব, ১৮৩১-এর বালাকোটের যুদ্ধ, ১৮৫৭-এর সিপাহী বিপ্লব, ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৬ সালের মুসলিম লীগের জন্ম, ১৯১৯-২০-এর খিলাফত আন্দোলন, ১৯৪০-এ হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ 'লাহোর প্রস্তাব', ১৯৪৬-এ নেহেরু কর্তৃক ক্যাবিনেট মিশন প্লান বানচাল, ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উপলক্ষে আহূত জনসভায় পরিকল্পিত আক্রমণ ও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধিয়ে খিদিরপুর ডকইয়ার্ডে কর্মরত নোয়াখালী ও কুমিল্লার কয়েক হাজার মুসলমান শ্রমিক হত্যা [আবুল হাশিমঃ ইন রিট্রোস পেকশন] ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ১১৯ জন মুসলিম প্রার্থীর মধ্যে ১১৬ জনকে বেঙ্গল এ্যাসেমব্লীতে জয়যুক্ত করে পাকিস্তান সৃষ্টির রায় দান, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা— বাংলাদেশ সৃষ্টির পটভূমির এতসব ঘটনা এতসব ইতিহাস কি এক কথায় মুছে যাবে? দেশের মানুষ কি করে ভুলে যাবে যে, ১৯৪৭-এ স্বাধীনতা হয়েছিল বলেই ৫৫ হাজার বর্গমাইলের ৪ কোটি অবহেলিত উপেক্ষিত নাঙ্গাভুখা মুসলমান স্বাধীনতার গৌরব অর্জন করতে পেরেছিল। জেলা শহর ঢাকা ২০০ বছর পর আবার রাজধানীর ঐশ্বর্যে ঝলমল করে উঠেছিল। দেশে সৃষ্টি হয়েছিল একাধিক কলকারখানা, ব্যাংক,

www.icsbook.info

বীমা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকাসহ জেলা শহরেও সৃষ্টি হয়েছিল রেডিও স্টেশন, টিভি স্টেশন। আকাশবাণীতে যারা অচ্ছুৎ ছিল সেই মুসলমান ছেলে-মেয়েরা নিজ নামে গান গাওয়ার, নাটক করার সুযোগ পেয়েছিল। '৪৭-এর স্বাধীনতা হয়েছিল বলেই ঢাকাকে কেন্দ্র করে শিল্প সাহিত্য অঙ্গনে বিপুল সংখ্যক মুসলমান ছেলে-মেয়েদের অবাধ দৃপ্ত পদচারণা সম্ভব হয়েছিল। আজ গণমাধ্যমগুলোতে '৪৭-এর দেশ বিভক্তিকে অপরাধ আখ্যায়িত করা হচ্ছে। ১৯৪৭-এ এদেশের আপামর জনসাধারণ যারা পাকিস্তানে যোগ দেবার জন্য আইন সভায় ভোট দিয়েছিলেন, পরোক্ষভাবে তাদের সমাজদ্রোহী, দেশদ্রোহী প্রতিপন্ন করা হচ্ছে।

যারা নিজেরা তুর্কী বা ফারাসী ভাষী হয়েও বাংলা ভাষাকে জাতে তুলেছিল, যারা নিজের জীবন বাজি রেখে দেশের মানুষকে মগ, বর্গী, মারাঠা, দস্যুদের কবল থেকে বাঁচাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, যারা নিজের জমিদারি বাঁধা রেখে এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার মত দানশীলতা দেখালেন, তারা হয়ে গেলেন উৎপীড়ক। আর যারা এদেশকে লুণ্ঠন করলো, এদেশের মানুষের উৎপাদিত কাঁচামালের পয়সায় কলকাতার সমৃদ্ধি ঘটালো, শান্তি নিকেতন গড়লো, গরীব চাষীদের পীড়ন করলো—তারা হয়ে গেলেন আপনজন। গণমাধ্যমগুলোকে এ ভাবেই গণবশীকরণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এদের আসল উদ্দেশ্য গণমাধ্যমগুলোর অপব্যবহার করে মানুষের চৈতন্য, আবেগ এবং অনুপ্রেরণার শক্তিকে অবশ করে ফেলা, জাতির চিন্তাশক্তিকে ভোঁতা করে তাকে রোবটের মত আজ্ঞাবহ দাসে রূপান্তরিত করা।

ইতিহাস যারা বিকৃত করে, তারাই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়, এটাই ইতিহাসের বিধান। রবীন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন তার 'ভারত তীর্থে' শক, হূন, পাঠান, মোগল সব 'এক দেহে লীন' হয়ে যাক। কিন্তু তা হয়নি, হবারও নয়। কোনো দেশেই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীকে এক গোষ্ঠীতে পরিণত করা সম্ভব হয়নি। তবু ষড়যন্ত্র চলে। যেমন ভারতে চলছে। সেখানে কাশ্মীরের ৬৮% অহিন্দু, পাঞ্জাবের ৬৩% শিখ, নাগাল্যান্ডের ৮৬%, মেঘালয়ের ৮২%, অরুণাচলের ৭১%, মিজোরামের ৯৩% অহিন্দুকে হিন্দু বানানোর চেষ্টা চলছে। তাদের এক দেহে লীন করার যে ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সেখানে আগুন জ্বলে উঠেছে। বাংলাদেশেও এমন দুরভিসন্ধি সফল হবে না। যারা এ চক্রান্তে মেতেছে, তাদের মনে রাখা উচিত, গিলোটিন অস্ত্র নির্মাতা রাজা চতুর্দশ লুই নিজেই তার গিলোটিনের শিকার হয়েছিলেন।

১৫.১২.৯৬

www.icsbook.info

চলচ্চিত্রে নিজের মুখ

চলচ্চিত্রে আজকাল নিজের মুখ দেখা যায় না বলে আহাজারির অন্ত নেই। সেদিন এক ভদ্রলোক গরম গরম বক্তৃতায় সিনেমা শিল্পের অধঃপতনের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, সিনেমার জীবননিষ্ঠতার অভাবের কথা, সিনেমার চরিত্রহীনতার কথা। আরও বলছিলেন, এমন বস্তাপচা সিনেমা শিল্প বন্ধ করে দেয়ার কথা।

আজকাল তর্কের অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছি। সাধারণত তর্ক করতে যে লজিক বা যুক্তি লাগে, তার ধার এখন নেই। সব ফয়সালাই এখন শক্ত হাতের লাঠিবাজিতে। কব্জির জোর এখন যুক্তির জোরকে ছাড়িয়ে গেছে। অতএব, মৌন থাকাই শ্রেয়।

কিন্তু কেন জানি সেদিন ভদ্রলোকের কথার জবাব দিয়ে বসলাম। বললাম, সিনেমা শিল্প বন্ধ করার দাবী শুধু আপনার মুখেই শুনছি না, সেদিন দায়িত্বশীল এক মন্ত্রীও একই কথা বললেন। কিন্তু ভাই, একবারও কি ভেবে দেখেছেন, এদেশে বন্ধ করার কাজটা যত সহজে করা যায়, গড়ার কাজটা কিন্তু তত সহজে করা হয় না। যেমন ধরুন না, পূর্ব পাকিস্তান আমলের ৭০ টা পাটকল এখন বন্ধ। হরিপুরের তেল উঠানো বন্ধ। তেঁতুলিয়ার শালবাহনের তেল এবং গ্যাসকূপ কংক্রীট ঢেলে সীল করে দেওয়া হয়েছে। সেই তেল এখন সীমান্তের অপর পারে জলপাইগুড়ির রায়গঞ্জ থেকে তোলা হচ্ছে। কক্সবাজারের খনিজ বালির মহামূল্যবান "কালো সোনা" আহরণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মংলা সমুদ্র বন্দরে এখন অচলাবস্থা। দেশের রাজনীতিবিদরা প্রতিদিন সব কিছু বন্ধ, অচল করে দেবার ঘোষণা দিচ্ছেন। স্বাধীনতার আড়াই যুগ পরেও নিত্যদিনের হরতাল, ঘেরাও, অবরোধে মানুষ গৃহবন্দী জীবন যাপন করছে। যুদ্ধাবস্থার মত চারদিকে গোলাগুলি, কামান, পটকা, বোমার শব্দে মানুষ রাত্রে ঘুমোতে পারে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য শিক্ষা বন্ধ। শিল্পকারখানায় চাঁদাবাজির জন্য উৎপাদন বন্ধ। ফারাক্কার পানি বন্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বন্ধ। স্থল ও জলপথে চোরাচালান এবং আকাশপথে উলঙ্গ সংস্কৃতির অবাধ অনুপ্রবেশের ফলে অর্থনীতি এবং মূল্যবোধের স্বাভাবিক বিকাশ বন্ধ। এর সঙ্গে আর একটি বন্ধ যুক্ত হলে হয়তো এমন কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। তবে ঐ যে চরিত্রহীনতার জন্য কেবল সিনেমা শিল্পকে এককভাবে দায়ী করলেন, ঐ কথাটা আপনার ঠিক না। বলুন জাতি হিসেবে আমাদের চরিত্র ঠিক নেই- তারই খানিকটা প্রভাব পড়েছে সিনেমা শিল্পে।

আপনার সন্তান যদি প্রশ্ন করে, আমি কে? উত্তর দিতে পারবেন? সে বাড়ীতে রান্না খায় এক রকম, জামা-কাপড় পরে এক রকম, পালা-পার্বণ, উৎসব-অনুষ্ঠান উদযাপন করে এক রকম। সেই বাড়ীতে কাব্যে, সাহিত্যে, নাটকে জাতীয় পরিচয় তুলে ধরা হয়

www.icsbook.info

অন্যরকম। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তৎকালীন নেতা-বুদ্ধিজীবীরা নতুন আদর্শের এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইলেন, যাতে পরোক্ষভাবে মনে হতে পারে, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের অর্থই ছিল ইসলামী মূল্যবোধের সংগে যুদ্ধ। তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলে হাজার বছরের ট্রাডিশনকে মুছে দিতে চাইলেন। অথচ ১৯৭৪ সালে বসন্ত চ্যাটার্জি নামক একজন ভারতীয় সাংবাদিক তার 'ইন সাইড বাংলাদেশ' নামক বইতে লেখেন," মুসলমানদের বাঙালি বলে পরিচয় দেবার কোন অধিকার নেই।" বসন্ত বাবু আরও বলেন,"বাঙালি কালচারে মুসলমানদের কোন অবদান নেই। ওটা নিতান্তই উচ্চবর্ণের হিন্দু কালচার। বাঙালি বাঙালি বলে চিৎকার করে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা যাবে না।" কিন্তু আমাদের মিডিয়াগুলোতে, শিক্ষা ব্যবস্থায়, শিল্প চর্চার ক্ষেত্রে শিকড় বিচ্ছিন্ন বাঙালির সংস্কৃতির দাপাদাপি এত ব্যাপক হলো যে, আমাদের নব প্রজন্মের জাতীয়তাবোধ অনিশ্চিত হয়ে পড়লো। তারা ভুলে গেল কী তাদের জাতীয় পরিচয়? তারা কি বাঙালি, বাংলাদেশী, না মুসলমান? পরিচয়হীনতায় চরিত্রভ্রষ্ট হলো সমগ্র জাতি।

১৯৩৫ সালে জওহর লাল নেহেরু তার আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন,"মুসলমানদের ঐক্যের কারণ তাদের কালচার সম্পর্কে গর্ববোধ। তারা মনে করে, ইসলামের কালচারই তাদের নিজস্ব কালচার।" '৭১-এর পর মুসলমানদের এই গর্ববোধকে খর্ব করার চক্রান্ত হতে লাগল। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তাঁর 'দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' নামক বইয়ের দ্বিতীয় খন্ডে বলেছেন, "এদেশে মুসলমান আসার আগে কালচার বলে কিছু ছিল না। তারা সাপ, ব্যাঙ, গাছ, পাথর ইত্যাদি পূজা করতো। তাদের মধ্যে ভাল বামনও ছিল না।" বাঙালি সাজতে গিয়ে আমরা সেই অপসংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যের পথেই পা বাড়ালাম। আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হলো দেবদেবী, পটপটারী প্রভৃতি পূজার আদর্শ, নরবীল, শিশুবলি, সতীদাহ এবং বর্ণাশ্রম ও জাতিভেদ প্রথার মত নিহিলিজম চিন্তাধারা, সেবাদাসী, খাজুরাহো এবং রামায়ণ মহাভারতের মত ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অসংযমী জীবন ব্যবস্থার কালচার এবং বর্ণাশ্রম প্রথায় নির্যাতিত পূর্বপুরুষদের দানব, বানর, হনুমান, অসুর প্রভৃতি কলঙ্কমাখা নামের ঐতিহ্য। বাঙালি সাজতে গিয়ে গর্ব করার মত সর্বোচ্চ মাপকাঠি হিসেবে পেলাম সবেধন নীলমণি রবি ঠাকুরকে। ফেরদৌসী, রুমী, জামী, সাদী, খৈয়াম ,হাফিজ, ইকবাল, গালিব, নজরুল, জসীম উদ্‌দীন ফররুখের ঐতিহ্যের আলো জীবন থেকে নিভিয়ে ফেললাম। ঢাকাই মসলিন, লালবাগ দুর্গ, সাত গম্বুজ মসজিদ, টঙ্গীর পুল, সোনারগাঁও- এর ইমারতরাজি, দিল্লীর লালকেল্লা, আগ্রার তাজমহল, দেওয়ানই আম, দেওয়ানই খাস কিংবা পারস্য, মিসর, তুরস্ক, স্পেনের শত শত বছরের ঐতিহ্যকে জীবন থেকে মুছে ফেলে দিলাম।

www.icsbook.info

রইলো শুধু একটি নামসর্বস্ব বাঙালি সংস্কৃতি। যার দৈর্ঘ, প্রস্থ, তল, উচ্চতা সম্বন্ধে কারো কোন ধারণাই নেই।

ঐতিহ্য হচ্ছে প্রত্যাশার রূপ, আকাংখার ফসল। সেই ফসলে যখন মড়ক লাগলো, তখন তা সংক্রমিত হলো জীবনের সর্বত্র। জাতীয় জীবনে এক লক্ষ্যহীন, স্বেচ্ছাচারী মনোবৃত্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। রাজনৈতিক জীবনে নেমে এল বিশৃঙ্খলা, সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা, শিক্ষা সাংস্কৃতিক জীবনে বিশৃঙ্খলা। চলচ্চিত্র সেখানে ধোয়া তুলসী পাতা থাকবে কি করে? একটা নামবিহীন, উদ্দেশ্যবিহীন, নক্সাবিহীন, পরিচয়বিহীন জাতির পক্ষে সুস্থ-সুন্দর মৌলিক কিছু সৃষ্টি করা কি সম্ভব?

এদেশে যখন চলচ্চিত্রের কিছুই ছিল না, তখন তো নির্মিত হয়েছিল, 'জাগো হুয়া সাভেরা', 'আসিয়া', 'আজান' 'মাটির পাহাড়', 'সূর্যস্নান', 'সান অফ পাকিস্তান', 'আনোয়ারা', 'নয়ন তারা', 'শহীদ তিতুমীর', 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা', 'নদী ও নারী' কিংবা 'সূর্য দীঘল বাড়ীর' মত আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি। ১৯৫৯ সালে নির্মিত আখতার জাংকারদার পরিচালিত 'জাগো হুয়া সাভেরা' ছবিটি মস্কো চলিচ্চত্র উৎসবে স্বর্ণপদকসহ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে বিশেষভাবে পুরস্কৃত হয়। '৭১-এর আগে সীমিত কারিগরি সুযোগে যে ছবি নির্মিত হয়েছিল, সেগুলোর মান ছিল উন্নত। সে সব ছবিতে দেশের মাটি, মানুষের চেহারা দেখা যেত। স্বাধীনতার পর দেশে যেমন সৃষ্টি হল নৈরাজ্য, অরাজকতা, তারই ঢেউ এসে লাগল চলচ্চিত্র শিল্পে। এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন,"চলচ্চিত্র শিল্প বাংলাদেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে, সেটা কালো টাকার দ্বারা অর্থনীতি ক্ষেত্রে সৃষ্ট নৈরাজ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।" (ইন্টারকাট ১৯৮৯)

১৯৭৩ সালে জহিরুল হকের 'রংবাজ' ছবি দিয়েই চলচ্চিত্রে রংবাজি শুরু হল। বম্বের ছবির মত মারপিটের ভাইরাস সংক্রমিত হল বাংলাদেশের ছবিতে। কালো টাকার প্রভাবে কলুষিত হল চলচ্চিত্র অঙ্গন। সৎ নির্মাতারা হাত গুটিয়ে নিলেন। নকল ছবি নির্মাণের হিড়িক পড়ে গেল মেধাহীন, যোগ্যতাহীন নির্মাতাদের মধ্যে। এ প্রসঙ্গে মাহমুদা চৌধুরী (দৈনিক দিনকাল ১৬-১০-৯২) এক প্রবন্ধে বলেছেন,"বস্তুত, বাংলাদেশে ছবি নকলের অবাধ সুযোগ সৃষ্টি হয় শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে। এই সময়ে লুটেরা লুম্পেন শ্রেণীর কালো টাকা পুঁজি হিসেবে চলচ্চিত্র শিল্পখাতে জমা হয়। মুনাফার স্বার্থে ভারতীয় ও পাকিস্তানী ছবির প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারে মেধাহীন একটি শ্রেণী নিষিদ্ধ ভারতীয় ও পাকিস্তানী ছবির নাম-গোত্র পাল্টে অন্ধ নকল করে মুনাফা লুটতে থাকে।"

www.icsbook.info

এভাবেই জাতীয় চরিত্র বদলে যাওয়ার সাথে সাথে শিল্প-সংস্কৃতির সাথে তাল রেখে চলচ্চিত্রও তার চরিত্র হারিয়ে ফেলে। চলচ্চিত্র থেকে বিদায় নেয় মৌলিকত্ব, সৃজনশীলতা, মূল্যবোধ, জাতীয় চেতনা। স্বাধীনতার পর শিল্প, সাহিত্য, নাটক যেমন কলকাতামুখী হল, চলচ্চিত্রও পথ ধরলো বম্বে-মাদ্রাজের। এ ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রকে এককভাবে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ঐতিহ্যকে না মানলে সভ্যতার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়, মৌলিক সৃষ্টির অনুপ্রেরণা থাকে না। "ইয়্যাকা নাবুদু ও ইয়্যাকা নাসতাইনের" পথ ধরেই এদেশের সংখ্যাগুরু মানুষ চিরন্তন সংস্কৃতির পথ পরিক্রমা করে এসেছে। হঠাৎ তাকে থামিয়ে দেয়া হল। বলা হল, যে পথে এতদিন চলে এসেছ, সে পথ তোমার নয়। তুমি মুসলমান নও। বাঙালি নামক তালগোল পাকানো একটা কিছু। যার শুরু '৭১-এর জিরো পয়েন্ট থেকে।

প্রত্যেক সভ্যতা তার সাফল্যের চূড়ায় উপনীত হয় ঐতিহ্য, চেতনা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে। ধর্মই সেই সংস্কৃতির পাদপীঠ রচনা করে। স্বাধীনতার পর জীবনের বিকাশকে রুদ্ধ করা হল ধর্মনিরপেক্ষতার নামে এক প্রকার ধর্মহীনতা আমদানি করে।

ভারতের জওহর লাল নেহেরু সারা জীবন ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলতেন। কিন্তু তার 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া' গ্রন্থটি পড়লে দেখা যাবে, তিনি সারা জীবন হিন্দু কালচারেরই আদি স্বরূপ সন্ধান করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধী ১৯২১ সালে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ঘোষণা করলেন,"আমি নিজেকে একজন সনাতনী হিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতেছি।" ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশমাতাকে 'কালী মাতার' প্রতিরূপ কল্পনা করে লিখলেন,"ডান হাতে তোর খড়গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শংকাহরণ।" তার 'গোরা' উপন্যাসে পরিত্যক্ত শ্বেতাঙ্গপুত্র গোঁড়া হিন্দু পরিবারে লালিত-পালিত হওয়ার ফলে সাদা চামড়ার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে কুলীন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারছেন না। এসবই তাদের ঐতিহ্য চেতনার ফল। বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিত রায় এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন,"আমি শান্তি নিকেতনে নন্দলাল বসুর কাছে ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিলাম, ফাইন আর্ট শেখার জন্য নয়- আমাদের ট্রাডিশনটা কি জানতে। কিভাবে (আর্টে) ইন্ডিয়ান ট্রাডিশনটা ঢোকান যায় সে চেষ্টা আমি করেছিলাম।" সত্যজিত রায় ইন্ডিয়ান ট্রাডিশন কী সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন,"আমার জীবনে সবচেয়ে হিট বইয়ের মলাট 'নামাবলীর ডিজাইন দিয়ে 'পরম পুরুষ' বইয়ের মলাট।" সত্যজিত রায় ভারতীয় সংগীতে মন্দিরের স্থাপত্যকলার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন,"আমাদের সংগীতের সঙ্গে মন্দিরের স্থাপত্যের মিল আছে। যেমন মন্দিরের একটা বেস থাকে, যেটাকে আলাপ

www.icsbook.info

বলা যেতে পারে। তারপর মন্দির আস্তে আস্তে উপরে উঠতে থাকে, তখন সেখানে কারুকার্য আরও সূক্ষ্ম, আরও জটিল হয়ে যেতে থাকে- সেই রকম সংগীতের তানকারি। তারপর চূড়াটা পয়েন্টেড হয়ে শেষ হয়।" সত্যজিত রায় একদিকে বলেছেন,"তিনি ধর্ম মানেন না, অপরদিকে বলেছেন কাশী আমাকে বেশী টানে।" এটাই স্বাভাবিক, একেই বলে নাড়ীর টান। এখান থেকেই রস সংগ্রহ করে তাঁরা বিকশিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা নাড়ী কেটে ফেলেছি, শিকড় কেটে ফেলেছি। আজ আমরা শিকড় বিচ্ছিন্ন মরা গাছ। সামনে-পেছনে শুধুই উষ্ণ মরুভূমি। সুতরাং শুধুই চলচ্চিত্রকে দোষারোপ করে লাভ নেই। চলচ্চিত্রতো জাতীয় জীবনের, সমাজ জীবনের উপরি কাঠামো। জাতীয় জীবনের অন্তরে হাত রাখুন। অনুভব করার চেষ্টা করুন কে আমরা? কী আমাদের পরিচয়? কোন্‌টা আমাদের জীবন দর্শন? ইতিহাস, ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিই বা আমাদের কোন্‌টা? ভাবালুতা বা আবেগ দিয়ে দাঙ্গা করা চলে, রাজনীতি করাও হয়তো চলে। কিন্তু ইন্টেলেকচ্যুয়াল বেস তৈরী করা যায় না। ইন্টেলেকচ্যুয়াল বেস না থাকলে সৃজনশীল শিল্পকর্ম আশা করবেন কি করে?

২৬.০১.৯৬

www.icsbook.info

গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন

গ্রুপ থিয়েটার ভাবনার উদ্ভব হয় চীন দেশ থেকে। চীনারা জাপানী আক্রমণ ঠেকানোর জন্য গ্রামে গ্রামে গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তারা গ্রামে গ্রামে দেশপ্রেমমূলক অপেশাদারী নাট্য মঞ্চায়নের ব্যবস্থা নেয়। এইসব নাটক চীনের সাধারণ মানুষকে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভীষণভাবে উদ্দীপিত করে। শহুরে শিক্ষিত মহলে অপেশাদার নাট্য ভাবনার উদ্ভব হয় তখন থেকেই।

এই উপমহাদেশে গ্রুপ থিয়েটার কনসেপ্টের জন্ম চল্লিশের দশকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখন শুরু। সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র মিলে 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটিউট' নামে একটা সংগঠন সৃষ্টি করেন। সেই সংগঠনের প্রথম সভাপতি ছিলেন বাগেশ্বরী প্রফেসর অব আর্ট জনাব শাহেদ সোহরাওয়ার্দী এবং সম্পাদক ছিলেন সেদিনের কৃতী ছাত্র জলিমোহন কাউল। এদের শেষ অফিস ছিল ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে। যেখানে পরে "সোভিয়েট সুহৃদ সংঘ" এবং "ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ" নামে দুটি সংগঠন গড়ে ওঠে। এই ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের নাট্য বিভাগটির নামই পরে 'গণনাট্য বিভাগ' রাখা হয়। 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের' এই গণনাট্য বিভাগের নামকরণ থেকেই ১৯৪৩ সালে সর্বভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্ভব হয়। চীনারা যেমন জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে নাটককে জনমত সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করেছিলেন, এই উপমহাদেশেও তেমনি সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরোধিতাকল্পেই জন্ম হয় 'গ্রুপ থিয়েটার' আন্দোলনের। এ প্রসঙ্গে সেদিনের প্রেক্ষিতটা স্মরণ করা যেতে পারে। সময়টা ছিল ১৯৪২-৪৩ খৃস্টাব্দ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল। কলকাতা তখন জাপানী বোমারু বিমানের আওতায় এসে গেছে। বৃটিশ সরকারের নির্দেশে দেশের সব নৌযান আটক করা হল। রাতারাতি সৃষ্টি করা হল ধান-চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল জিনিসের কৃত্রিম অভাব। চাল নেই, কাপড় নেই, কেরোসিন নেই, লবণ নেই। দেশের বুকে চাপিয়ে দেয়া হল অনাকাংখিত, মনুষ্যসৃষ্ট এক মহাদুর্ভিক্ষ। লক্ষ লক্ষ মানুষ এক মুঠো ভাত না পেয়ে এক বাটি ফেনের আশায় দরজায় দরজায় ঘুরে পথে-প্রান্তরে লাশ হয়ে পড়ে থাকতে লাগল। এই অমানবিক মৃত্যুর প্রতিবাদে শিল্পী জয়নুল আবেদীন আঁকলেন অমর দুর্ভিক্ষের ছবি। আর বিজন ভট্টাচার্য লিখলেন দুর্ভিক্ষ বিরোধী নাটক 'নবান্ন'। ১৯৪৪ সালের ২৪শে অক্টোবর কলকাতার 'শ্রীরঙ্গম (বর্তমানে বিশ্বরূপা) রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত হল সেই নাটক। নাট্য ভাবনায়, নাট্যকলায়, নাট্যাভিনয়ে এবং নাট্যরীতিতে সংযোজিত হল এক নতুন মাত্রা। সংঘনাট্য বা গ্রুপ থিয়েটারের যাত্রা শুরু সেদিন থেকেই। "গণনাট্য

www.icsbook.info

সংঘই" প্রথম পূর্বেকার বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত নাট্যচর্চাকে পরিকল্পিত রূপ দিলেন। পেশাদারী নাট্য ব্যবসার পাশাপাশি অপেশাদারী নাট্যান্দোলনের সূচনা করলেন, স্বতঃস্ফূর্ত নাট্য চর্চাকে রূপান্তরিত করলেন সংঘবদ্ধতায়। এভাবেই জাতির সংকটকালে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদী শক্তিতে রূপান্তরিত করার সংকল্প নিয়েই সৃষ্টি হয়েছিল 'গ্রুপ থিয়েটার' আন্দোলনের।

বাংলাদেশের নাট্য ঐতিহ্য অত্যন্ত সুপ্রাচীন হলেও গ্রুপ থিয়েটার কথাটার প্রচলন হয় '৭১-এর স্বাধীনতার পর। ১৯৭২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা শহীদদের স্মরণে বাংলা একাডেমী আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় কলকাতা গ্রুপ থিয়েটার, 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' পরিবেশিত 'মৌচোর' ও 'রাজরক্ত' নাটকের পাশাপাশি ঢাকার নাট্যদল 'থিয়েটার' পরিবেশন করেন 'মুনীর চৌধুরী' লিখিত 'কবর' নাটকটি। এ ছাড়াও সে সময় টিএসসি কেন্দ্রিক নাট্যদল, নাট্যচক্রের তরুণ নাট্যকর্মীরা নিজেরাই নাটক লিখে নিজেরাই প্রযোজনা করতে শুরু করেন। ১৯৭৩-এর দিকে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় দর্শনীর বিনিময়ে নাটক দেখার রেওয়াজ চালু করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসেন। তারা মঞ্চস্থ করলেন বাদল সরকার রচিত নাটক 'বাকি ইতিহাস'। নাটক পাড়া বলে অধুনা পরিচিত বেইলী রোডের 'মহিলা সমিতি' মঞ্চ তখনও নাটকের জন্য উন্মুক্ত হয়নি। আর গ্রুপ থিয়েটার নামটিও এভাবে সাধারণ্যে প্রচলিত হয়নি তখনও।

এদেশে গ্রুপ থিয়েটার কথাটি চালু হয়েছে আকস্মিকভাবে। সম্ভবত ১৯৭৪ সালের দিকে বেইলী রোডের মহিলা সমিতি মঞ্চে অনুষ্ঠিত একটি নাট্যানুষ্ঠানের নাটকে পুলিশ হামলা চালিয়ে ১৯২২ সালের 'দি বেঙ্গল এমিউজমেন্ট ট্যাক্স এ্যাক্ট' এবং ১৯৭৬-এর কন্ট্রোল অফ পাবলিক ড্রামাটিক পারফরমেন্স এ্যাক্টের ধারামতে নাট্য মঞ্চায়ন বন্ধ করে দেয়। কয়েকজন নাট্যকর্মী এব্যাপারে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি এক নির্দেশের মাধ্যমে (নং পি এ পি-১২৩ (২)/৭৫) সেন্সর পদ্ধতি সহজতর এবং প্রমোদকর রহিত ঘোষণা করেন। এই প্রমোদকর রহিত হওয়াটা যাতে শুধুমাত্র অপেশাদার নাট্যদলগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সেজন্য অর্থ মন্ত্রণালয় এই নাট্যদলগুলোকে সৌখিন/গ্রুপ থিয়েটার নামে অভিহিত করেন (মেমো নং আইএফ ৬-৯/৭৫ এটি/২৯৪)। সেই থেকে অনেকটা ট্যাক্স রহিতকরণের সুবিধা লাভের লক্ষ্যেই গ্রুপ থিয়েটার কথাটার বহুল প্রচলন শুরু হয়। কোন আদর্শ উদ্দেশ্য এর পিছনে ছিলনা।

গ্রুপ থিয়েটারের মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য হল "নাটকের জন্য নাটক নয়, জনগণের জন্য নাটক" করা। লক্ষ্য ছিল থিয়েটারের ভাষায় দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর সুখ-দুঃখ আশা-আকাংখার রূপ প্রতিফলিত করা। স্বৈরাচার ফ্যাসিইজম বা সাম্রাজ্যবাদী

www.icsbook.info

আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনমনে সচেতন প্রতিবাদী ভাব সৃষ্টি করা। অতীতে এই আদর্শ-উদ্দেশ্যে গ্রুপ থিয়েটারগুলো চালিত হলেও আজ সেই চরিত্রে শৈথিল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নাটকে এখন বৃহত্তর জনগণ অদৃশ্য। নাটক হচ্ছে- "বাই দি ইনটেলেকচ্যুয়ালস ফর দি ইনটেলেকচ্যুয়ালস"। নাটকে এখন জাতীয় সমস্যা নেই, আছে সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে রাখার সুকৌশল প্রয়াস। নাটকে প্রকৃত আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ নেই। বরং আকারে-ইঙ্গিতে তাদেরই নান্দীপাঠ ও স্তুতিগান করা হচ্ছে।

আমাদের ছোট্ট দেশটি স্থলপথ এবং জলপথ উভয় দিক থেকেই বৃহৎ ভারতবর্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই যে বৃহৎ সীমান্ত সেই সীমান্তকে অশান্ত করে রেখেছে কারা, তা আমাদের জানতে বাকি নেই। বাংলাদেশের কয়েকশ' মাইল জুড়ে সমুদ্র সীমান্তে রয়েছে ভারতের ব্লু-ওয়াটার নেভীর একাধিপত্য। যে নেভী এশিয়ার অন্যতম শক্তিশালী নৌবাহিনী হিসেবে স্বীকৃত। ভারত তার আপন শক্তিমত্তায় মত্ত হয়ে আন্তর্জাতিক নদীতে বাঁধ দিয়ে গ্রীষ্মকালে আমাদের শুকিয়ে মারছে, বর্ষাকালে ভাসিয়ে দিচ্ছে। তালপট্টি দখল করে রেখেছে। চাকমাদের অস্ত্র ট্রেনিং দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। স্বাধীন বঙ্গভূমিওয়ালাদের প্রত্যক্ষ মদদ দিয়ে আমাদের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু আমাদের নাটকে এইসব সংকট সমস্যার প্রতিফলন নেই। বরং নাটকগুলো এমন এক আবহ সৃষ্টি করে রেখেছে যেন দেড় হাজার মাইল দূর থেকে ভারতের উপর দিয়ে লাফিয়ে এসে পাকিস্তান আবার এ দেশটা দখল করে নেবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাইতে গিয়ে আমরা কি চেয়েছিলাম? চেয়েছিলাম পাকিস্তান আমলের চাইতে উন্নততর জীবন। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, শিল্প-কারখানার বিকাশ, শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি, বেকারত্বের অবসান, উন্নততর কৃষি ব্যবস্থা, মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা সম্পদ আহরণ। এই চাওয়ার একটিও পূরণ হলো না কেন? স্বাধীনতার পরপর দেশের অক্ষত অর্থনীতি ১৬ হাজার কোটি টাকা দান-খয়রাত পাওয়ার পরও 'তলাবিহীন ঝুড়ি' হিসাবে আখ্যায়িত হল কেন? পাকিস্তান আমলে যে অর্থনীতি ছিল স্থিতিশীল, সেই এশিয়ার মডেল হিসেবে আখ্যায়িত অর্থনীতি, একরাতে পাপুয়া নিউগিনি, ইকুয়েডরের পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেল কেন?

বিদেশী পণ্য এসে আমাদের বাজার সয়লাব করে দিচ্ছে, আর আমাদের নিজস্ব শিল্প কারখানাগুলো রুগ্ন হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে কেন? একটা সুঁচ কিংবা একটা আলপিনও দেশে তৈরী হচ্ছে না কেন? এই সব কেন'র উত্তর নাটকে খুঁজলে পাওয়া যাবে না।

www.icsbook.info

নাটক মেতে আছে বাঙালি-বাঙালিত্ব নিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে, পাকিস্তানী হানাদার কিংবা রাজাকার আলবদর নামক বর্তমানে অবাস্তব এক কাল্পনিক জুজুর ভয় দেখান নিয়ে। যেন এগুলোই দেশের সমস্যা। এগুলো সমাধান হলে ফারাক্কার বাঁধ ভেঙ্গে যাবে, অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। নাটকের 'মাস এ্যাপীল' নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নাটক এখন কিছু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে।

অতএব আজকের তরুণ নাট্যকর্মী, যারা নাটকের জন্য জীবন বিলিয়ে দিয়েও সুফল পাচ্ছেন না, নাটক নিয়ে দেশের আপামর জনসাধারণের হৃদয়ের কাছে পৌঁছতে পারছেন না। দেশের আরও ভিতরে তাদের চলে যেতে হবে। এই মাটির ইতিহাস জানতে হবে। এ মাটির জন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের অসীম ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের ইতিহাস জেনে নিতে হবে। দেশকে ভালবেসে দেশের শত্রু সনাক্ত করে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তবেই সে নাটক প্রকৃত গ্রুপ থিয়েটার পদবাচ্য হবে,আপামর জনসাধারণ সে থিয়েটারের সুফল পাবে। তরুণ নাট্যকর্মীদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

২৬.১১.৯৩

www.icsbook.info

মঞ্চ নাটক কোন্ পথে ?

সেদিন এক ভদ্রলোক আমাকে দেখেই উচ্চস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন, "পাইছি পাইছি"। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,"কি পাইছেন ভাই?" ভদ্রলোক বললেন,"নাটকের লোক পাইছি। আপনার লগে একখান বোঝাপড়া আছে।" বলেই খপ করে আমার হাতটা ধরে টানতে টানতে রাস্তার পাশে নিয়ে গিয়ে দেয়ালে সাঁটান একটি পোস্টারের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে জিজ্ঞাসা বললেন,"ঐটা কি দেখতাছেন?" আমি বললাম,"পোস্টার"।

ভদ্রলোক বললেন,"হু পোস্টার"। একজন দাড়ি, টুপী ও আলখাল্লা পরা সুন্নতি লেবাসের মুসলমানের গলায় টাকার ঝোলা ঝুলাইয়া দিয়া তাকে সুদের কারবারী কুসীদজীবী বানান হইছে। এইটা আপনাগো নাটকের একখান পোস্টার?"

তারপর তিনি বলতে লাগলেন, "আচ্ছা আপনেই কন! সমাজে যাদের সুদখোর হিসেবে দেখেছি। এমনকি, পুরান নাটক নভেল, গল্প, উপন্যাসেও যাদের কথা কুসীদজীবী হিসেবে পড়েছি, তারাতো কেউ মুসলমান আছিল না। তা হঠাৎ কইরা মুসলমান লেবাসধারীগো সুদখোর বানাইয়া রং তামাশা করনের আপনেগো খায়েশ হইলো ক্যান? যতদূর শুনছি পোস্টারের ঐ নাটকটি লেখছেন এক ফরাসী সাহেব নাম তার মলিয়ের। তিনিও তো তার মূল নাটকে মুসলমানেরে সুদখোর বানান নাই। নাটকটি নাকি ইন্ডিয়ায় 'কঞ্জুস' নামে হিন্দিতে অনূদিত হইছিল। সেখানেও মুসলমানেরে সুদখোর বানান হয় নাই। ফরাসী সাহেব যা করেন নাই। ইন্ডিয়ার দাদাবাবুরা যা করেন নাই, হেই কাম আপনেরা করতে শুরু করলেন ক্যান? অর্থাৎ এক সুন্নতি লেবাসের মুসলমানেরে সুদখোর বানাইয়া নিজের গায়ে থুথু ছিটানো শুরু করলেন ক্যান?

খাড়ান যাইয়েন না আর একখান কথা আছে। সেদিন নাট্যপাড়া দিয়া যাইতেছিলাম। এক আজগুবি নাটকের ব্যানার দেইখ্যা থামলাম। নাটকের নাম 'ক্ষেতমজুর খৈমুদ্দিন'। নাটকের নামটা লইয়া চিন্তা করতে শুরু করলাম। ভাবলাম ক্ষেতমজুরটা না হয় বুঝলাম। আমাগো বাপদাদারা ক্ষেতমজুর আছিল। সেই টাইটেল এত সহজে মুছবে কেমনে? তাই ক্ষেতমজুর টাইটেল নামের আগে মাইন্যা নিলাম। কিন্তু খৈমুদ্দিন কি? আরবী, ফারসী ভাষায় তো খৈমুদ্দিন শব্দ আছে বইল্যা কখনও শুনি নাই। তবে কি এটাও মুসলমান নামের বিকৃতি? শুনলাম এটাও নাকি অনুবাদ নাটক। মূল নাটকটি নাকি লেখছিলেন 'লু-সূন' নামে এক চীনা সাহেব। তিনিতো তার নাটকের নাম 'ক্ষেতমজুর খৈমুদ্দিন' রাখেন নাই। এই বিকৃত মুসলমানী নামটি রাখছেন এদেশেরই

www.icsbook.info

কোন এক অনুবাদক, যার বাবা হয়তো বিশ্বাস করতেন মুসলমান সন্তানদের ভাল নাম রাখা তার ধর্মের নির্দেশ। যার জন্য পুত্রের নাম কোন শুদ্ধ আরবী বা ফারাসী ভাষায় রেখেছিলেন।

'৪৭- এর আগে এই দ্যাশে হিন্দু জমিদার বাবুরা মুসলমান রায়ত প্রজাদের ভাল নাম পছন্দ করতেন না। তাই তারা কাশেম উদ্দিনকে কাঁচু মুদ্দিন, কলিম উদ্দিনকে কালুমুদ্দি, ফেলুশেখ ইত্যাদি বিকৃত নামে ডাকতেন। আজও পার্শ্ববর্তী দ্যাশে সেই ট্রাডিশনই চলতাছে। তারা নিজ দেশের মুসলমান রাষ্ট্রপতির নামও শুদ্ধ কইর‍্যা উচ্চারণ করে না। স্বাধীনতা তো আপনে গো 'ক্ষেতমজুর' টাইটেল মুইছ্যা ফালানের সুযোগ দিচ্ছিল। কাঁচুমুদ্দিন নাম শুদ্ধ কইর‍্যা নেওনের সুযোগ দিছিল। এই '৯৩ সনে আইসা আবার নিজেই নিজের নাম বিকৃত করতাছেন ক্যান? স্বাধীনতার সীমা তো মাইনষের জীবন রক্ষার প্রাচীর হয়। আপনেরা তো সাহেব, সেই প্রাচীর ভাইঙ্গা ফালানের চেষ্টা করতাছেন। সেদিন আপনে গো টেলিভিশনে এক গান শোনলাম। গান বাঁধছেন সরকারী কলেজের এক অধ্যাপক, প্রচার হইতেছে সরকারী টেলিভিশনে। গানের বাণী হইল গিয়া "আমার ভাবতে অবাক লাগে, এই দেশেতে জন্মেছিল রবীন্দ্র, নজরুল।" রবীন্দ্র, নজরুল বোলে এই দেশে জন্মেছিলো। আপনেগো টেলিভিশন ম্যানেজারকে চিঠি লিখছি। আমারে জানাইতে হইব, এই দ্যাশের কোন্ জিলায় রবীন্দ্র, নজরুল জন্মাইছিল। জানাইতে না পারলে— বৃহৎ বঙ্গভূমিওয়ালাদের মত এই গান প্রচারের জন্য তাকে মাফ চাইতে হইবো আর ইতিহাস ভূগোল পাল্টে ফেলার জন্য ঐ গীতিকারকে বাতিল করতে হইবো।"

মনে হলো আমাকে পেয়ে ভদ্রলোকের অনেক দিনের জমাট বাঁধা ক্ষোভ বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত বেরিয়ে আসছে। তিনি বললেন, "দেহেন, আমিও নাটকের লোক। 'সবজীমহল ড্রামাটিক ক্লাবের নাম শুনেছেন? শোনেন নাই। আমি সেই আমলের লোক। ১৯৪৩ সালে 'নিশাত' (আজকের মানসী) সিনেমা হলে দর্শনীর বিনিময়ে প্রথম নাটক আমরাই করেছিলাম। আপনারা সেই ইতিহাস জানেনওনা মানেনওনা। নাটকের নাম ছিল "মেশিন ও মানুষ'। পরপর পাঁচ দিনে দশটি শো' হইছিল। আপনেরা বলেন আপনারাই নাকি ৭১'-এর পর "দর্শনী'র বিনিময়ে নাটক" চালু করেছেন। আমাদের সময় যে নাটক লেখা হইত সেগুলোর নাম ছিল ঃ 'সরফরাজ খাঁ', 'কামাল পাশা', সিন্ধু বিজয়, কাফেলা, স্পেন বিজয়ী মূসা, বিদ্রোহীপদ্মা, বাগদাদের কবি, সুলতানা রিজিয়া', 'মহররম', নৌফেল ও হাতেম, শেরে মহীশূর ইত্যাদি। মুসলমানের 'গলায় সুদের ব্যাগ ঝুলাইয়া দেওনের নাটক আমরা করি নাই। নিজেরে 'ক্ষেতমজুর খৈমুদ্দিন' কইরা হেনস্থা করনের নাটক আমরা করি নাই। আমরা নাটক করতাম শিরদাঁড়া সোজা

www.icsbook.info

করনের লাইগ্যা। জাতিকে উপরে উঠানোর লাইগ্যা। আমাদের সমাজে, ভ্রাতৃত্ব, জাতীয়তা-মূল্যবোধকে মানুষের মনের দুয়ারে পৌছাইয়া তাদের সৎ, দেশপ্রেমিক, স্বাধীন আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে গইড়া তোলাই ছিল আমাদের নাটকের উদ্দেশ্য। আপনেগো নাটকে সে রং নাই। আজকের নাটকে— নন্দন তত্ত্ব, শিল্প সৃষ্টির বালাই নাই। নাটক এখন কেবলমাত্র বিকিকিনির পণ্যে পরিণত হইতেছে, 'জাস্ট লাইক' এ কমোডিটি। যেখানে পয়সা পাইতেছে সেখানেই নিজেরে বিকায়ে দিতেছে। ফলে নাটকে বিদেশী সংস্কৃতি, মতবাদ কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ প্রকট। এই রাজনীতির নাটক আমাদের '৪৭- পূর্ব অবস্থায় ফিরাইয়া নেওনের চেষ্টা করতাছে। বাঙলা, বাঙালি, রবীন্দ্র, বঙ্কিম, জীবনানন্দ প্রমুখের সেন্টিমেন্ট খাড়া কইরা আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কথা ভুলাইয়া দেওনের চেষ্টা করতাছে। নিজস্ব পরিচয় ভোলনের আগে দুইটা কথা মনে রাইখেন— নিজস্ব সংস্কৃতি ভুইল্যা যাওনের ফলে বিশাল মোঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। আর এই উপমহাদেশের মুসলমানরা অস্পৃশ্য হিসেবে বাঁচতে চায় নাই দেইখ্যাই দু'শ বছর সংগ্রাম কইর‍্যা আবার নিজস্ব হোমল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই হোমল্যান্ডে বইস্যা আজ আপনারা দাড়ি-টুপিকে ব্যঙ্গ কইরা নাটক লিখতাছেন। মুসলমানের নামের বিকৃতি ঘটাইতাছেন নাটকের মূল চরিত্রগুলির নাম অর্ণব, হিমাদ্রি, বকুল, রেনু ইত্যাদি রাইখ্যা, সেই দাদাবাবুদের কায়দায় চাকর-বাকরের নাম আলতাফ নয়তো আব্দুল রাখিতেছেন। ভারতীয় অভিনেত্রীদের মত অজন্তা স্টাইলে নাভিমূল অনাবৃত রাখিয়া শাড়ী পরা এবং টিপ, সিঁদুর পরাকে বলতাছেন বাঙ্গালী সংস্কৃতি। এইভাবে দেশের ও জাতির কি সর্বনাশ ঘটাইতেছেন— আজ রাইতে শুইয়া শুইয়া একবার ভাইবেন— যান।"

ভদ্রলোকের কথাগুলো এতো তেজদীপ্ত ও ওজস্বী ভাষায় বলেছিলেন যে, আমি প্রতিবাদ করার ভাষা বা মুহূর্ত খুঁজে পাইনি। সুতরাং যখন তিনি আমাকে 'যান' বলে বিদায় দিলেন, তখনও তার দিকে 'শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম'। আর সেই ভারতীয় গানটাই মনে মনে আউড়ালাম,"তুমি চলে গেলে, চেয়ে চেয়ে দেখলাম, আমার বলার কিছু ছিল না।'

১৯.১১.৯৩

www.icsbook.info

মসজিদ নগরী কি মূর্তি নগরীতে রূপান্তরিত হবে?

খবরে প্রকাশ, ১৯৯৫ সালের মধ্যেই নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দু'শ' ভাস্কর্য মূর্তি স্থাপন করা হবে। ১৫টি মূর্তি ইতোমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে, ৯৫টি নির্মিত অবস্থায় রক্ষিত আছে। বাকিগুলো নির্মাণের তোড়জোড় চলছে। একটা বিশেষ মহল নাকি এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে।

প্রাক-ইসলামী যুগে পূজার নামে ব্যক্তি বা প্রাকৃতিক বস্তুতে দেবত্ব আরোপ করে পূজা করার প্রবণতা যেমন— সর্বদৈত্যবাদ, সূর্যদেবতা, চন্দ্রদেবতার পূজা, লিঙ্গপূজা ইত্যাদি মানুষের মধ্যে যৌন প্রবৃত্তি, সন্তান বলিদান, কুমারী বলিদান, স্থূল ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মত অমানবিক আচার-আচরণের জন্ম দিয়েছিল বলে ইসলাম মূর্তিপূজাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ইসলাম যে সব মৌলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তার প্রথম এবং প্রধান হলো আল্লাহর একত্ব এবং তার বিমূর্ততা। আল্লাহ ছাড়া আর কারও শ্রেষ্ঠত্বের চিত্র যাতে মানুষের মন-মগজে অংকিত হতে না পারে, সে জন্যই ঘোষণা করা হল, ইসলাম ও মূর্তি এক সঙ্গে অবস্থান করতে পারে না। ইসলামের একেশ্বরবাদ মানবজাতিকে দুঃসহ নৈতিক অধঃপতন থেকে মুক্তি দিয়েছিল বলেই সারা পৃথিবীতে ইসলামের দ্রুত প্রসার ঘটে। আমাদের ধর্মই আমাদের সংস্কৃতি। কারণ ধর্মই আমাদের মানবতা শিখিয়েছে, মূল্যবোধে বিশ্বাসী করেছে। তাই ধর্মের সুশীতল ছায়াকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে আমাদের সাহিত্য, সংগীত, নাটক, চিত্রকলা। এগুলোই আমাদের জীবনাদর্শ প্রচারের হাতিয়ার। এর মাধ্যমেই আমরা আমাদের জীবনবোধকে মানুষের জীবনের পরতে পরতে পৌছে দিতে পারি। সুতরাং ধর্মীয় চেতনায় পরিবর্তন শিল্পকলাকেও প্রভাবিত করবে এটাই স্বাভাবিক। মূর্তি নির্মাণ পৌত্তলিকতার প্রতীক হিসেবে ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর ইসলামী চিত্রকলাতেও পরিবর্তন আসে। মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়ায় ইসলামী চিত্রকলা থেমে যায়নি বা পিছিয়েও পড়েনি। তারা মূর্তি শিল্পের পরিবর্তে আরবী অক্ষরলিপি বা ক্যালিওগ্রাফী এবং 'এ্যারাবেক্স' নকশার জন্ম দিয়ে পৃথিবীর শিল্পকলায় নবযুগের সূচনা করে। মুসলমানদের উদ্ভাবিত এই বিশেষ চিত্রশিল্প রুচি ও সংস্কৃতির বিশুদ্ধতায় প্রাচীন গ্রীস ও আধুনিক ইউরোপের যে কোন বিখ্যাত চিত্রকলার নিদর্শনকে অতিক্রম করে গেছে। মহান শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এ্যারোবেক্স নকশার উদ্ভাবনে বিস্ময় প্রকাশ করে তার স্কেচে এই পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এই বিশেষ চিত্ররীতির নিদর্শন আজও ছড়িয়ে রয়েছে সমরখন্দ, বোখারা, গজনী, হিরাত, ইস্পাহান, তাব্রিজ, সিরাজ, বাগদাদ, ইস্তাম্বুল, কায়রো, দামেস্ক, মক্কা, মদীনা, কর্ডোভা এবং এই

www.icsbook.info

উপমহাদেশের কুতুবমিনার, তাজমহল, মতি মসজিদ, ইতিমাদ্‌দৌলা, লাহোরের বাদশাহী মসজিদ, পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, ঢাকার লালবাগ মসজিদ, তারা মসজিদ, কসাইটুলি মসজিদ, বায়তুল মুকাররম মসজিদ, শৈলকুপার যশোর মসজিদ, ময়মনসিংহ অষ্টগ্রামের কুতুবশাহী মসজিদ, এগার সিন্দুরের শাহী মসজিদ, রাজশাহীর কুসমবা মসজিদ, সিলেটের শংকরপাশা মসজিদ, প্রভৃতি অগণিত মসজিদ, মিনারের অপরূপ কারুকার্যে, স্থাপত্য কৌশলে। এই সব মসজিদে, মিনারে ইমামবাড়ায়, মুসলিম আর্ট এবং অলংকরণ পদ্ধতি আপন স্বকীয়তায় ভাস্বর হয়ে আছে। এই বাংলাদেশের প্রায় ১৩২০০০ মসজিদ মুসলিম স্থাপত্যরীতির অনুপাত, রুচি, নকশায়, ক্যালিওগ্রাফীর ব্যবহারে, সূক্ষ্ম ছন্দময় রেখায় উজ্জ্বল ও বিচিত্র রংয়ের সমাবেশে বিশ্বের চিত্রামোদির আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

হাজার হাজার বছর আগে মুসলমানরা এ দেশে এসেছে কখনও ধর্মপ্রচারকের বেশে, কখনও বা বিজয়ী শাসনকর্তা হিসেবে। তাঁরা কেউ আপন মূর্তি নির্মাণ করে চিরঞ্জীব হবার প্রয়াস পাননি। সম্রাট শাহজাহান তার প্রিয়তমা মহিষী মমতাজ মহলের মূর্তি নির্মাণ করতে চাইলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারীমূর্তি নির্মাণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি অনন্য স্মৃতিসৌধ তাজমহল নির্মাণ করে মুসলিম আর্টকে পৃথিবীতে অবিস্মরণীয় করে গেছেন। যতদূর জানা যায়, ১৮০৩ খৃঃ ইংরেজরা এই উপমহাদেশে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মূর্তি বানানো শুরু করে। ইংরেজদের আমল থেকেই এদেশে হিরোকাল্ট বা মূর্তিবাদের আদর শুরু হয়। মানুষকে বেদীর উচ্চতায় তুলে দেবত্ব দেবার চেষ্টা ইংরেজরাই প্রথম প্রচলন করে।

এই হিরোকাল্ট বা নেতৃবৃন্দের মূর্তি নির্মাণ সমাজকে বিপদের সম্মুখীন করে এবং এই হিরোওয়ার্শিপ একজন মুসলমানকে তার মূল ধর্মীয় আদর্শ থেকে যে বিচ্যুত করে তার বহু নজীর বিদ্যমান আছে। গান্ধিজীর বায়ান্ন ফুট মূর্তি, গান্ধিজীকে ভগবানে রূপান্তরিত করেছে। কিছুদিন আগেও রাশিয়া, পোল্যান্ডের পথে পথে লেনিন, স্ট্যালিনের মূর্তি নির্মাণ করে তাদের পূজার যোগ্য করে তোলা হয়েছিল। এক সময় এদেশের সিনেমা হলে বৃটিশ রাজের ছবি দেখানো হলে দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান দেখানো হত। এ সবই মূর্তিপূজার শামিল। শিল্প-সংস্কৃতির যে উপাদান মুসলমানের একেশ্বরবাদী চিন্তার পরিপন্থী, যে শিল্পকর্ম মুসলমানকে পৌত্তলিকতার দিকে আকর্ষণ করে, মুসলমান বরাবরই তাকে সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। মুহাম্মদ বিন কাসিম থেকে শুরু করে কত বীর, সফল রাষ্ট্রনায়ক, স্বাধীনতা যোদ্ধা, পীর-দরবেশ, আওলিয়া এদেশের মাটিকে ধন্য করেছেন, কিন্তু কারও মূর্তি নির্মাণ করে কখনও পূজা করা হয়নি। মুসলমানের জীবন চিন্তা মূর্তিপূজার সম্পূর্ণ বৈরী। এর কারণ হিসেবে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মনিরুদ্দীন ইউসুফ বলেছেন,"কাপালিক যদি তার বিগ্রহকে সার্বভৌম কল্যাণের প্রতীক

www.icsbook.info

বলে মনে করে, তবে তার সামনে নরবলি উৎসব আয়োজন করাকে সে দেবীর সন্তুষ্টির উপায় বলে গণ্য করবে; নরবলির মধ্যে সে অন্যায় কিছু দেখতে পাবে না।" নব্বইভাগ মুসলমানের এই দেশ মসজিদ নগরী হিসেবে গর্ব অনুভব করে। পথে পথে মূর্তি নির্মাণের ঐতিহ্য কোন দিন এদেশে ছিল না। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ফুটপাতে শনিঠাকুরের মন্দির নির্মাণের ঐতিহ্য পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরে দেখা যায়। চব্বিশ পরগনা জেলার বেড়াচাঁপার এক ভদ্রলোককে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে পথের উপরেই কালি মন্দির নির্মাণ করতে দেখেছিলাম। পথ দখল করে মূর্তি নির্মাণ ওদেশের ঐতিহ্য হলেও পশ্চিমবঙ্গের বা ভারতের মুসলমানরা কিন্তু কোথাও কোন মুসলিম কবি, বুদ্ধিজীবী বা সমাজসেবীর মূর্তি নির্মাণ করতে দেয়নি। একবার পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকার কলকাতায় কবি নজরুলের একটা ভাস্কর্য মূর্তি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সে দেশের মুসলমানদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তাদের সে উদ্যোগ পরিহার করতে হয়। মূর্তিপূজক হিন্দু জনবহুল ভারতের মাটিতে যেখানে মুসলমানরা মুসলমানের মূর্তি নির্মাণে বাধা সৃষ্টি করে, সেখানে নব্বই ভাগ তৌহিদবাদীর এই দেশে কিছু আবেগ-আপ্লুত মানুষ হাজার বছরের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে মুসলমানবরেণ্য ব্যক্তিদের মূর্তি নির্মাণে মেতে উঠেছে। ১৩২০০০ মসজিদের গর্বিত এই দেশকে তারা দক্ষিণ ভারতের মত মূর্তির দেশে রূপান্তরিত করতে চাইছে। ভারতের হিন্দি ছবিতে দেখা যায় প্রেমে বিফল নায়ক বা নায়িকা অশ্রুসজল নয়নে মন্দিরের ঘন্টা বাজিয়ে দেবীর সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে দুঃখের কথা জানান। আর দেবী তখন মনুষ্যকণ্ঠে জলদগম্ভীর স্বরে নায়ক-নায়িকাদের প্রেমের সফলতায় উপদেশ দেন, অথবা আশীর্বাদ করেন। ইদানীং আমাদের মূর্তিগুলোও কেবল মূর্তিতে সীমাবদ্ধ নেই। ইতোমধ্যেই তাদের দেবত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে। গত একুশে ফেব্রুয়ারীর বিটিভি'র একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে দেখা গেল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন মূর্তির মুখে হিন্দি ফিল্মের দেবতার মত কথা ফুটে উঠেছে। মূর্তিগুলো মনুষ্য কণ্ঠে, সামনে দন্ডায়মান তরুণদের ভবিষ্যত দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে। অর্থাৎ দেখানো হল সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তে বিশ্বাস নয়, ঐ মূর্তিই এখন আমাদের দিশারী।

আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের সংস্কৃতির মূল উৎস আমাদের মহানবীর নির্দেশ ও তাঁর কর্মময় জীবন। এই দুইয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে জীবনবোধ, সে জীবনবোধই আমাদের উত্তম-অধমের মান নির্ণয় করতে শিখিয়েছে। সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতির পার্থক্য নির্ণয় করতে শিখিয়েছে। মানুষকে বাড়ীতে দাওয়াত করে খাওয়াব, নাকি মানুষ বাড়ীতে ঢুকলে হাঁড়ি-পাতিল ফেলে দিব, কোন্‌টা উত্তম সেটাই আমার সংস্কৃতি। সেই উন্নত সংস্কৃতিই আমাকে শিখিয়েছে মানুষ মহামর্যাদাবান, তারা পার্থিব কোন কিছুর কাছে কিছুই প্রত্যাশা করে না, পৃথিবীর কোন কিছুই তার দেবতা

www.icsbook.info

নয়। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। খোদা ছাড়া কারো কাছেই তার কোন প্রত্যাশা নেই। খোদা ছাড়া কেউই তার উপাস্যও নয়।

যখন শিল্পকলায়, সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসে, তখন বুঝে নিতে হবে ধর্মবোধেও পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে। তাই আজ আত্ম আবিষ্কারের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের চারিদিকে সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হয়েছে। ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ আমাদের সংস্কৃতি আজ এক দিশেহারা অবস্থায় পরিণত হয়েছে। আমাদের শিল্পে-সাহিত্যে যে জঞ্জাল জমা হয়েছে তা মানবতাবাদী ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যদি সংস্কার না করি, তাহলে জাতি হিসেবে আমরা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ব। স্মরণ করি নজরুলের সেই সাবধানবাণী ঃ 'সদ্য প্রসূত প্রতি শিশুটিরে পিয়ায় অহর্নিশ/শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতা বলি তিলে তিলে মারা বিষ।'

আজ সাবধান হতে হবে। মনে রাখতে হবে স্পেনের ইতিহাস থেকে ওরা জেনেছে সংস্কৃতির চেহারা বদল করেই একটি জাতিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাই আজ আমাদের সবচেয়ে বড় আত্মরক্ষা হল আমাদের ঐতিহ্যকে রক্ষা করা। আপন সংস্কৃতিকে রক্ষা করা।

১৮.০৬.৯৩

www.icsbook.info

"তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো"

দেবালয়, পূজা প্রদীপ এবং অগ্নি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। একটি ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ, অর্থহীন। রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর 'পূজা' পর্বের গানে বহুবার পূজার সংগে প্রদীপের উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন ঃ "আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে করব নিবেদন, আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন"। কিংবা "আমার এই দেহখানি তুলে ধর তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো"। দীপ চালনা দেবপূজার আবশ্যিক অঙ্গ বিধায় প্রদীপ হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট মঙ্গলের প্রতীক।

আজকাল আমাদের দেশে কেউ কেউ প্রদীপ জ্বেলে কোন শুভ কাজ উদ্বোধনের রেওয়াজ চালু করছেন। বলছেন, এটা বাঙালি কালচার। অনেকে আবার এই প্রদীপ কালচারকে ইসলামী কালচারের অঙ্গ হিসেবেও প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন। সুতরাং এই প্রদীপ বা অগ্নি কালচারের সূত্র উৎসের সন্ধান বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জরুরী এবং অত্যাবশ্যকীয় বলে অনুমিত হচ্ছে। তৌহিদবাদী ইসলাম এই প্রদীপ কালচারকে অনুমোদন দেয় কি-না, সে বিষয়টিও চিন্তা করে দেখতে হবে।

হিন্দু শাস্ত্র অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, অগ্নি হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যক্ষ দেবতারূপী ভগবান। ঋগ্বেদ সংহিতায় অগ্নিকে ২০০ সুক্তে স্তব করা হয়েছে, যা দেবরাজ ইন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন দেবতা সম্বন্ধে করা হয়নি। ঋগ্বেদে অগ্নিকে এতই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে যে, ঋগ্বেদ শুরু হয়েছে অগ্নি বন্দনা দিয়ে (১/১) এবং শেষ হয়েছে অগ্নিবন্দনার মাধ্যমেই (১০/১৯১)। ঋগ্বেদ বলে, অগ্নি দেবতা ও মানবের মধ্যস্থতাকারী। অগ্নি যজ্ঞ সারথি। ইনি নিজের রথে দেবতাদের বহন করে যজ্ঞস্থলে নিয়ে আসেন। অগ্নি ছাড়া যজ্ঞ হয় না। শুভ কাজ 'আগুনের পরশমণি' ছাড়া সম্পন্ন হয় না। দেবতাগণ অগ্নি ব্যতীত যজ্ঞস্থলে বা শুভ কাজে উপস্থিত হন না। সেই জন্য অগ্নিকে পুরোহিত বলা হয়েছে। ঋগ্বেদ ছাড়া হিন্দুদের অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও অগ্নির বৈশিষ্ট্যের বহু উল্লেখ দেখা যায়। যেমন মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ হরিবংশ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে, 'অঙ্গিরার পুত্র', 'সন্ধিলার প্রপৌত্র', 'ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র', দক্ষকন্যা স্বাহার স্বামী (অগ্নি পুরাণ), ধর্মের ঔরসে ও বসুভার্যার গর্ভে অগ্নির জন্ম (মহাভারত অনুশাসন) ইত্যাদি নানাভাবে অগ্নির মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। মাহামুনি, 'বশিষ্ঠ'কে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য অগ্নি দেবতার মুখ থেকে যে ১৫৪০০ শ্লোক নির্গত হয়, সেগুলোই 'অগ্নিপুরাণ' নামে খ্যাত। এছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজার দুটি প্রধান অঙ্গ 'হোম' ও 'আরতি' দুটি অবশ্যপালনীয় আচার। 'হোম করা' অর্থ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক দেবতার

www.icsbook.info

উদ্দেশ্যে যজ্ঞের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান এবং আরতির অর্থ দেবমূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে বরণ করা, যাকে দীপচালনা বলা হয়।

'আরতি মঙ্গলময়'। আরতির সময় দেবমূর্তিকে দণ্ডায়মান অথবা উপবেশন অবস্থায় কল্পনা করে পঞ্চ প্রদীপ দ্বারা ঠাকুরের চরণে তিনবার এবং মূর্তির চারদিকে আরও তিনবার ঘুরানোর পর চামর ব্যজন, শংখধ্বনি ইত্যাদির মাধ্যমে আরতি সম্পন্ন করতে হয়। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ 'আরতি' এবং মঙ্গল প্রদীপের বর্ণনা করেছেন নানাভাবে। যেমন, প্রাতঃকালীন মঙ্গল আরতির রূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

"মঙ্গল বাজত খোল করতাল,
মঙ্গল নাচত হরিদাস ভাল
মঙ্গল ধূপ-দীপ লইয়া স্বরূপ
মঙ্গল আরতি অতি অপরূপ।"

রাধাকৃষ্ণের মঙ্গল আরতির রূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

"মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর
মঙ্গল সখিগণ প্রেম রসে ভোর
রতন প্রদীপ করুঁ টলমল মোর
ঝলকত বিধুমুখ শ্যাম সুগৌর।"

শ্রীযুগল আরতি করা হচ্ছে রতন প্রদীপ জ্বেলে ঃ

রতন প্রদীপ জ্বালি ললিতা পিয়ারী
আরতি করতহি বদন নিহারী।"

প্রায় প্রতিটি ধর্মপ্রাণ হিন্দু বাড়ীতে তুলসী দেবীর সন্ধ্যারতি করা হয় প্রদীপ জ্বেলে। তুলসী দেবীর সন্ধ্যারতির রূপ বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

"ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য আরতি
ফুলেলা কিয়ে বরখা রবখানি
ছাপ্পান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন
বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মঙ্গল প্রদীপের উৎস মঙ্গল আরতি থেকেই, যা অগ্নি দেবতার সংগে সম্পর্কিত।

এছাড়াও হিন্দুদের বাহ্যপূজার শ্রেষ্ঠতম পূজা 'হোম'। ভূমিতে বালি দিয়ে একটা চতুষ্কোণ বেদী তৈরী করা হয়। সেই বেদীর মাঝখানে 'কুশ' বা খড় দিয়ে একটি পদ্ম

www.icsbook.info

তৈরী করে তার উপর 'ওঁ' অক্ষরটি লিখতে হয়। পরে গব্যঘৃত কর্পূর ইত্যাদি দিয়ে 'হোমানল' অর্থাৎ আগুন জ্বালিয়ে— আপতচাল, চিনি, যব, কর্পূর ইত্যাদি সহযোগে 'চরু' তৈরী করে সেই আগুনে আহুতি দিতে হয়। পরে সেই অগ্নিকে প্রণাম করে প্রার্থনা করান হয়। হে মহান দেবতা অগ্নি! তুমি আমাদের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে দিয়ে তোমার জ্যোতিতে হৃদয় পূর্ণ করে দাও। আমাদের যত কু-গ্রহ, বাইরের ও অন্তরের যত প্রবল শত্রু আছে, তাদের তোমার হোমানলে দগ্ধ করে দাও।"

"ওঁ বরদে দেবী পরম জ্যোতি ও ব্রহ্মণে স্বাহা
ওঁ পূর্ণ পরম ব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপায় স্বাহা,
ওঁ পূর্ণ মদঃপূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ মূদচতে
পূর্ণসৎ পূর্ণ মাদায় পূর্ণ মেবাব শিষ্যতে,
ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

যখন পূজার হোমানলে উঠবে জ্বলে একে একে তারা,
আকাশ পানে ছুটবে বাঁধনহারা।"

হিন্দুদের নিকট অগ্নি সদা মঙ্গলময় বিধায় তাদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, পূজা-অর্চনা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই অগ্নির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অগ্নিকে দেব বহনকারী সারথি জ্ঞান করায় কোন যাগ যজ্ঞ বা শুভকাজে অগ্নি ছাড়া দেব আবির্ভাব সম্ভব নয়। আর এই বিশ্বাস থেকেই এসেছে প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভকাজ উদ্বোধন করার প্রথা। প্রদীপের মাধ্যমেই দেবতা আবির্ভূত হন, তিনি কাজটিকে শুভ পথে পরিচালনা করেন। এই বিশ্বাসেই মঙ্গল প্রদীপের জন্ম। প্রদীপ কালচারের উৎস পূজা আরতি থেকেই। মুসলমানের জীবন-চিন্তা ভিন্ন ধরনের। তারা বিশ্বাস করে, আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, রক্ষাকর্তা। আসমান-জমিনের সব কিছু একমাত্র তাঁরই।" আল্লাহর সাথে যে কোন বস্তু বা প্রাণীর শরীক স্থাপনের পশ্চাদমুখী প্রবণতার বিরুদ্ধেই ইসলামের অবস্থান।

প্রতিটি মুসলমান আল্লাহ, রসূল এবং আল্লাহর প্রেরিত বাণী সম্বলিত আল-কোরআনে বিশ্বাসী। সেই আল-কোরআন শিক্ষা দিচ্ছে "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি পরম করুণাময়, দয়াময়, যিনি বিচার দিনের স্বামী। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি, এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।" যে সব মৌলিক ভিত্তির উপর ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, তার প্রধান হল আল্লাহর একত্ব, বিমূর্ততা, ক্ষমতা, করুণা ও সর্বোচ্চ প্রেমের প্রতি বিশ্বাস। মুসলমান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে না,

www.icsbook.info

অন্য কারো কাছে মঙ্গল প্রত্যাশীও নয়। সে একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। সুতরাং মুসলমান যখন কোন কাজ শুরু করে সে আল্লাহর নাম নিয়েই শুরু করে। আল্লাহর কাছে মোনাজাতের মাধ্যমে শুরু করে। মানুষের প্রতি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং মঙ্গল প্রদীপই হোক কিংবা এই একই জিনিস যেখানে অন্য যে নামেই থাকুক তা যদি মানব কল্যাণে আল্লাহকে ছোট করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তবে তা অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে। আজ যে পরিবেশ হারামকে হালাল ঘোষণা দেবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে, সেখানে মঙ্গল প্রদীপ আমাদের ঈমান-আকীদা দুর্বল করার ক্ষেত্রে কি পরিমাণ কার্যকর ভূমিকা রাখবে, সেই ব্যাপারটাই আজ ভেবে দেখতে হবে। স্মরণ করতে হবে কোরআনের সেই উক্তি—"তবে কি তোমরা কোরআনের কিছু অংশ গ্রহণ করবে ও কিছু অংশ পরিত্যাগ করবে? যারা এরূপ করে, তাদের পরিণাম তো পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ও পরকালে কঠিন শাস্তি।" (২ঃ৮৫)

০৮.০৬.৯৩

www.icsbook.info

বাংলাদেশে বাউল চর্চা ও আমরা

হালফিল দেশে বাউল চর্চা বেশ প্রসার লাভ করতে দেখা যাচ্ছে। এইতো সেদিন বেশ জাঁক করে বাউল উৎসব হয়ে গেল। তাছাড়া এখানে-ওখানে, নাট্যোৎসবে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রায়ই বাউল গানের আসর বসবে বলে প্রচার চালানো হচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয় হলো— এসব অনুষ্ঠানে বা আসরে যারা অংশগ্রহণ করেছেন এদের কেউই বাউল নন বা বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত নন। অর্থাৎ এরা কেউ মধুকরি করে, ভিখ মেঙ্গে, আখড়া বেঁধে জীবনও কাটান না, কিংবা রসিক সুজনের সাক্ষাৎ পেলে মালাচন্দন, কণ্ঠিবদল করে মিথুনাত্মক যোগ-সাধনায়ও ব্যাপৃত হন না। এদের কপালে তিলক নেই। গলায় তুলসী কাঠের মালা নেই। পুরুষদের শিখা নেই, মেয়েদের চূড়া করে চুল বাঁধা নেই, এরা কোন মোহান্তের আখড়ায় কামিনী-কমলিনীদের নিয়ে গূঢ় দেহসাধনায়ও মগ্ন থাকেন না। এদের প্রায় সকলেই গৃহী, কর্মে বিশ্বাসী, ধর্মেও বিশ্বাসী। সবাই সংসার-ধর্ম পালন করেন। মুর্শিদী, ভাওয়াইয়া, দেহতত্ত্ব বা লালন ফকীরের গানের চর্চা করেন। বিশ্বাসে এরা প্রায় সকলেই তাসাউফপন্থী, সূফী সম্প্রদায়ভুক্ত। এদের গানেই এদের ধর্মভাব ফুটে উঠে। যেমন-

'নামটি লা শরীকালা
সবাই শরীক সেই একেলা
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা
আপনি খাবি খায় ডুবে।'

এরা সাধারণত লালন ফকীর, দুদুশাহ, পাঞ্জুশাহ, হাসনরাজা প্রমুখের গান বা একই ভাবধারার গান গেয়ে থাকেন। কথা হলো— লালনশাহ, হাসনরাজা প্রমুখ কি তবে বাউল ছিলেন?

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় একবার হাসনরাজাকে বাউল কবি বলে উল্লেখ করায় হাসনরাজার পৌত্র, আজকের জাতীয় অধ্যাপক, দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন,"আশ্চর্যের বিষয়, সুপ্রসিদ্ধ পন্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী হাসনরাজাকে বাউল শিল্পী বলে দাবী করেছেন। তার এ দাবীর মূলে ভাবপ্রবণতা ছাড়া কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। .... ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীর হয়তো জানা নেই যে, হাসনরাজা যৌবনেই সৈয়দ মাহমুদ আলী নামক এক পাঞ্জাবী দরবেশের হাতে মুরীদ হন। এই মাহমুদ আলী সাহেব ছিলেন চিশতিয়া তরীকার পীর। তিনি শেষ বয়সে সিলেট সদরের নিকটবর্তী বনকেলিতে স্থায়ীভাবে বাস করেন এবং এখানেই ইন্তেকাল করেন।" (মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২)। জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ সাহেব হাসনরাজা, লালন ফকীর প্রমুখকে বাউল আখ্যা দিতে নারাজ। কারণ, হাসনরাজা, লালন ফকীর এরা কেউই বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না।

www.icsbook.info

আসলে বাউল কি? বাউল বিশেষজ্ঞ ক্ষিতিমোহন সেনের মতে,"তাহারা মুক্ত পুরুষ, তাই সমাজের কোন বাঁধন মানেন নাই। তবে সমাজ তাহাদের ছাড়িবে কেন?" তখন তাহারা বলিয়াছেন, "আমরা পাগল, আমাদের ছাড়িয়া দাও, পাগলের তো কোন দায়িত্ব নাই। বাউলের অর্থ বায়ুগ্রস্ত পাগল।" শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন বাউলদের পাগল বলে আখ্যায়িত করলেও এ কথা সত্য যে, এদের বাউল নামের খোলসের মধ্যে যে সঙ্গীতাশ্রয়ী মরমী সাধন পথ লুকিয়ে আছে, তা একশ্রেণীর মানুষকে চিরকাল আকৃষ্ট করে এসেছে। তবে বাউল ও সূফীবাদী ফকীরদের এক করে দেখাও ঠিক হবে না।

বাউল একটা তত্ত্ববিশেষ। মিথুনাত্মক যোগসাধনই বাউল সম্প্রদায়ের মূল পদ্ধতি। বাউলের সাধনা দেহকেন্দ্রিক। দেহই এদের বৃন্দাবন। দেহবৃন্দাবনেই তাদের আরোপ সাধনা। অনুমানের পথ নয়, তাদের সাধনার নাম বর্তমান।

ভারতের বাউল গবেষক শ্রী সুধীর চক্রবর্তী "বাংলার বাউল" প্রবন্ধে লিখেছেন (দেশ, ৪ঠা মাঘ ১৩৯৮) — "বাউলদের অবাধ জীবনযাপনের মুক্ত ছন্দ, তাদের ছক ভাঙ্গার দুঃসাহস, সমাজ বন্ধনের প্রতিবাদী ঘোরাফেরা অনেককে আকর্ষণ করেছে। যেমন-দুবরাজপুরের তরুণ কবি লিয়াকত আলী এক সময় ছিলেন উদ্দাম বিস্ফোরক রাজনীতিক ঢেউ-এর শীর্ষে। জেল থেকে ফিরে সংস্কারমুক্ত প্রতিবাদী মনটাকে কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে তেমনভাবে আর রাখতে পারছিলেন না। সেই সময় বীরভূমে নানা বাউলের বৈঠকে ঘুরে পেয়ে যান চমৎকার এক মানসিক আশ্রয় ও মানবিক আস্থার উৎস। কেঁদুলীর মেলায় লিয়াকত সেই থেকে প্রতি বছর তাঁবু গাড়েন। লিয়াকত নিজে বাউল নন, কিন্তু সেই স্রোতধারার স্বচ্ছ জলে স্নান করে শুদ্ধ। লিয়াকত লিখেছেন— নারী পুরুষের সম্পর্ক একটাই, সেটা যৌন সম্পর্ক। এটাই প্রাকৃতিক সম্পর্ক। যা প্রাকৃতিক তাই ধর্ম, তাই সত্য। এর ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় হয় না। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর নারী-পুরুষের সম্পর্ক একরকম। একমাত্র মানুষই নারী ও পুরুষের ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্ক স্বীকার করে নিয়েছে। যেহেতু ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্ক একরকম নয়— মানুষের বানানো, সেহেতু এর ভুল-ভ্রান্তি সম্ভব— বাউলরা এই সত্যটা জানে। আর জানে বলে তারাই হচ্ছে গুটিকয় সেই মানুষ, যারা নারী-পুরুষের তথাকথিত ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্ক অস্বীকার করে বেঁচে আছে। তিনি আরও লিখেছেন,"একটা সাধন সঙ্গী নিয়ে কোন বাউল গোটা জীবন কাটায়। আবার অনেককেই দেখা যায় জীবনের বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন সাধন সঙ্গীর সঙ্গে। কখন যে কার সঙ্গে থাকবে কি পুরুষ কি নারী কেউই জানে না। নতুন কাউকে ভাল লাগলে পুরানোকে ছেড়ে যাওয়াই রীতি। কখনও বা নতুনকে ছেড়ে পুরনোর কাছে ফিরে যাওয়া। যে যখন যার সঙ্গে থাকে, সেই তার সুখ-দুঃখের সাধনার সাথী। স্থায়ীভাবে

www.icsbook.info

ঘরসংসার বলতে এদের কিছু নেই।" শ্রী সুধীর চক্রবর্তী তার প্রবন্ধে আরও লিখেছেন, বাউলদের ব্যাপারে দ্বিতীয় যে চিন্তা-ভাবনা বহু মানুষের মনে তাদের সম্পর্কে কৌতূহল অথবা বিদ্বেষ টেনে এনেছে সেটা চারি চন্দ্রভেদ। অর্থাৎ মল-মূত্র, রজঃবীর্য পান"। চারিচন্দ্র ভেদ ছাড়াও বাউলদের মধ্যে 'প্রেমভাজ্য' ভক্ষণের রেওয়াজও লক্ষ্য করা যায়। নর-নারী সম্মিলিত ভাবে নৃত্যগীতাদি করার পর তাদেরই বীর্যমিশ্রিত রুটি 'প্রেমভাজ্য'রূপে ভক্ষণ করলে মহাপুণ্য লাভ হয় বলে এক শ্রেণীর বাউল মতাবলম্বী বিশ্বাস করে।"

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার শ্রীকান্ত উপন্যাসে বষ্টুমী বাউল কমললতার এক অনন্য চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। কমললতার সাথে শ্রীকান্তের প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যটি তিনি এঁকেছেন এভাবে— বষ্টুমী কমললতা, অপরিচিত যুবক শ্রীকান্তকে দেখে রসিকতা করে প্রশ্ন করেছে— "কি গোসাঁই চিনতে পারো? বলিলাম না, কিন্তু কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে! বৈষ্ণবী কহিল, দেখেছ বৃন্দাবনে। বড় গোসাঁইজির কাছে খবরটা শোননি এখনো? বলিলাম, তা শুনেছি কিন্তু বৃন্দাবনে আমি তো জন্মেও যাইনি।

বৈষ্ণবী কহিল, গ্যাছো বৈকি! অনেককালের কথা স্মরণ হচ্ছে না। সেখানে গরু চরাতে, ফল পেড়ে আনতে, বনফুলের মালা গেঁথে আমাদের গলায় পরাতে। সব ভুলে গেলে? এই বলিয়া সে ঠোঁট চাপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বষ্টুমী কমললতার অতীত ইতিহাস বলতে গিয়ে শরৎচন্দ্র কমললতার জবানীতে লিখেছেন, "যার সঙ্গে তোমার আজ দেখা তার নাম মন্মথ, ও ছিল আমাদের বাজার সরকার। এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, আমার বয়স যখন একুশ বছর, তখন আমার সন্তান সম্ভাবনা হল।"

অর্থাৎ বাজার সরকার মন্মথের সাথে কমললতা নাম্নী উষার অবৈধ মিলনে উষা সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ে। অসহায় পিতা মেয়েকে নবদ্বীপে নিয়ে যান। সেখানে বিশ হাজার টাকা যৌতুকের বিনিময়ে বৈষ্ণব মতে, কণ্ঠিবদল করে মন্মথের সাথে উষার বিয়ে দিয়ে সামাজিক অপবাদ থেকে মুক্তি পেতে চান। উষার সে বিয়ে টেকেনি। পরে উষা গোসাঁই ধরে আখড়ায় বেরিয়ে যায়। সেই থেকে তার নাম হল কমললতা।

কলকাতার দেশ পত্রিকা ৪ঠা মাঘ, ১৩৯৮, ৫৯ বর্ষ, ১২ সংখ্যায় বাউলদের উপর এক প্রচ্ছদ নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল। সেখানে কিছু মহিলা বাউলের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়। সেই সাক্ষাৎকার থেকে অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হলো। বর্ধমান জেলার

www.icsbook.info

কিশোরীগঞ্জ গ্রামের মহিলা বাউল ননীবালা তার সাক্ষাৎকারে বলেন, "তিনি যে বাউলের সঙ্গে আছেন তার নাম রাধেশ্যাম। তার সঙ্গে তিনি বহু বছর ধরে আছেন।"

ননীবালা দাসীর সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে লীনা চাকী। প্রশ্নোত্তরটি এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

প্রশ্ন ঃ আপনার কত বছর বয়সে বিয়ে হয়?

উত্তর ঃ এই ধরো ১০ বছর হতে পারে, ১২ও হতে পারে। আমাদের কি এত বয়সের হিসেব থাকে?

প্রশ্ন ঃ আপনাদের বিয়েতে কি আমাদের মত সাত-পাক আচার-অনুষ্ঠান হয়?

উত্তর ঃ দেখ, তোমাদের যেমন স্বামী-স্ত্রী আমাদের বলে ক্ষ্যাপা-ক্ষ্যাপী। আমাদের মধ্যে বিয়ে কথাটাও চলে না, বলে সঙ্গিনী করেছে, ক্ষ্যাপী নিয়েছে। ধরো, কোন বাউলের কাউকে পছন্দ হলো, গুরুর সামনে তার সঙ্গে কণ্ঠিবদল করে পাঁচজন সাধু গুরুর সেবা দিলেই হয়ে গেল।

প্রশ্ন ঃ প্রায়ই দেখি বাউল এক ক্ষ্যাপীকে ছেড়ে আর একজনের সঙ্গে থাকে। তবে কি কণ্ঠিবদলের কোন মূল্য নেই?

উত্তর ঃ (একটু চুপ করে থেকে) আমার কথাই বলি, "আমার মা যার সঙ্গে কণ্ঠিবদল করিয়েছিল, সে হঠাৎ একদিন আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমার গুরুদেব আবার আর একজনের সাথে কণ্ঠিবদল করালেন। দুটো ছেলেও হলো। হঠাৎ একদিন সেও উধাও হয়ে গেল। ছেলেপুলে নিয়ে তখন কি অবস্থা আমার। তখন এই ক্ষ্যাপা রাধেশ্যাম ঠাঁই দিল।

প্রশ্ন ঃ এরকম জীবনে সুখই বা কি?

উত্তর ঃ কোন্ মেয়েরা বাউল জীবনে ঢোকে জানো? যাদের কোন গতি হয় না। ধরো, অল্প বয়সে কোন মেয়ে বিধবা হল, কিংবা স্বামী ছেড়ে চলে গেল। মেয়েটা তখন কি করবে? আত্মীয়-স্বজনের মুখঝাপটা, নানা বদনাম থেকে উদ্ধার করেন কোন বাউল গুরু।

প্রশ্ন ঃ আর ছেড়ে গেলে?

উত্তর ঃ কি আর করবে। আবার কোন বাউলের নেকনজরে পড়লেতো ভাল। না হলে ভিক্ষে করে বেড়াও করতাল বাজিয়ে।

www.icsbook.info

প্রশ্ন ঃ আমার মনে হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এটা ধর্মের ভেক ধরে চরম ভোগ-ব্যভিচারের পথ। ঠিক না?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, মজা মারার দল তো আছেই।

এতক্ষণ বাউল সম্প্রদায় নিয়ে যে বিশদ আলোচনা হল, তার সারসংক্ষেপ করলে এটাই দাঁড়ায়— বাউলরা গৃহিণী নন, আখড়াধারী। তারা বস্তুবাদী। দেহের সাধনা এবং দেহের সুখই তাদের পরম আরাধনার বস্তু। বাউলরা বিবাহ প্রথায় বিশ্বাসী নন, যখন যার সঙ্গে বাস করেন, তখনকার মত সেই তার স্বামী। তারা সমাজচ্ছুট, মুক্তস্বভাবের। বাউল সম্প্রদায় চারিচন্দ্র ভেদনামে মল-মূত্র, রজঃবীর্য পান করে যোগ সাধন করেন। গুরুর নির্দেশে যোগক্রিয়া ও মৈথুন বাউলবর্গের বৈশিষ্ট্য। বাউলদের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাদের অসাধারণ ভাব মূলের গান, যার নিজস্বতা সবাইকে আকৃষ্ট করে। এখন প্রশ্ন— সংগীত সাধনা ছাড়া এই ব্যভিচারী বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলিম সূফীবাদী ফকীরদের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে কি? নর-নারীর বিকৃত যৌন বোধের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে সুষ্ঠু, সুন্দর, শান্তিময়, সাংসারিক জীবন ব্যবস্থা এবং সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে নতুন সমাজ কাঠামো ও বিশ্বজনীন আদর্শ স্থাপন করে গেছেন বাংলাদেশের মুসলিম ফকীর ও সূফী সম্প্রদায় যেমন লালন ফকীর, হাসনরাজা, দুঁদুশাহ, পাঞ্জুশাহ প্রমুখ তারই মীরাস বহন করেছেন। লালন ফকীরের জীবনী আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, তার ধর্মমত আসলে ইসলামী সূফী মত, যার গোড়া পত্তন করেছেন পারস্যের অমর সূফী সাধক মাওলানা রুমী-জামীর মত অমর সাধক কবির লেখনী সৃষ্ট ভাববাদ। ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই এই উপমহাদেশের সূফীবাদের আদি দিশারী হিসেবে এসেছিলেন হজরত দাতা গঞ্জ বখশ, মুহাম্মদ বিন হাসান, হজরত খাজা মইনউদ্দিন চিশতী (রঃ), খাজা কুতুবুদ্দীন কাকী (রঃ), শেখ ফরিদউদ্দিন গঞ্জ শকর, হজরত নিজামউদ্দিন আওলিয়া প্রমুখ বিশ্বনন্দিত ওয়ালী-দরবেশ। বাংলাদেশের মুসলিম ফকিরগণ সেই সূফীবাদেরই উত্তরসূরি। কোরআন-হাদীসের মহান আদর্শের ওপর ভিত্তি করেই সূফীবাদ জন্মলাভ করেছে। আমাদের মুসলমান ফকীরগণ ব্যভিচারী বাউল নন, তারা ফকীর। তারা তালিব-উল-মওলা, অর্থাৎ খোদা সন্ধানী। লালন শিষ্য দুদুশাহ তাই লেখেন, 'তালেবেল মওলা যে জন হয়, কেরামন কাতেবিন তার খবর নাহি পায়।'

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, হঠাৎ করে লালন অনুসারীদের কিংবা মুসলিম ফকীর সম্প্রদায়কে জমায়েত করে বাউল উৎসব নাম দেওয়া হচ্ছে কেন? একি নিছক অজ্ঞতা, না কি এখানেও কোন সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য কাজ করছে?

১৮.০৮.৯৫

www.icsbook.info

মেলা আর নাই সে মেলা

মেলা মানে সম্মেলন বা একত্রিত হওয়া। মেলা মানে কোথাও মেলা করা। মেলা মানে মেলিয়া ধরা বা প্রদর্শন করা। মেলার আর একটা সহজ অর্থ মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হওয়া। মেলার মর্মরসে এর সবগুলো অর্থই বিদ্যমান। মেলায় যেমন একত্রিত হয়ে দেখা-শোনা, চেনা-জানার আকাংখা আছে, চলাচলের নেশা আছে, সাজগোছ বা বিপণনদ্রব্য প্রদর্শনীর বাসনা আছে, তেমনি নর-নারী, তরুণ-তরুণী, মিলে-মিশে একাকার হওয়ার গোপন স্পৃহাও আছে। সব মিলিয়ে মেলার একটা তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়, যার মূল গ্রামীণ বিন্যাসের অতলে গাঁথা।

সেকালে গ্রামীণ মানুষের জীবন ছিল বদ্ধ। যাতায়াত বা মেলা-মেশার সুযোগ ছিল কম। বিনোদনের ক্ষেত্র বা পরিবেশও ছিল সীমিত। চাষী মাঠে ফসল ফলাত। জেলে নদী কিংবা বিল-বিলান্তে মাছ ধরতো। কামার তার কামারশালে দা-কুড়াল, কাস্তে-লাঙ্গল বানাতো। কুমার মাটির হাঁড়ি-পাতিল তৈরী করতো। তাঁতী শাড়ী, লুঙ্গি, গামছা, চাদর ইত্যাদি বুনত। সারা বছরই ছিল তাদের ব্যস্ততা। কাদা মাটির রসপুষ্ট সহজিয়া মানুষগুলোর জীবন ছিল পৌনঃপুনিকতায় ভরা, একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন। জীবনের গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি লাভের আশায়, বছরের কোন একটা দিনে, তিথিতে বা ক্ষণে কোন একটা উপলক্ষকে কেন্দ্র করে আনন্দোৎসবে মেতে ওঠার স্পৃহা থাকাটা ছিল স্বাভাবিক বা সহজাত। এভাবেই হয়তো একদিন মেলার সৃষ্টি। এভাবেই নবান্নের মেলা, সত্য পীরের মেলা, গাজী পীরের মেলা, স্নানযাত্রার মেলা, নববর্ষ বা হালখাতার মেলা প্রভৃতি এমন আরও কত উপলক্ষ নিয়ে মেলা বসতো, এ গাঁয়ে ওগাঁয়ে। মেলা বসতো বটতলায় নয়তো বাঁশতলায়, মাঠে নয়তো হাটের ধারে, মেলা বসতো নদীর কিনারে। মেলা মানেই চলাচল, কেনাকাটা, পাঁপড়, কদমা, চিড়ে, খই, মুড়ি, জিলাপী, পরোটা, নাগরদোলা, সার্কাস, ভেপুবাঁশী কিংবা পাকুড় গাছের নীচে বয়াতীর প্রাণখোলা সুরে গান— "আল্লাহ্— ডাকি যে তোমারে/রহম নজর কর আমারে।" মেলা মানেই বিনোদন, ফুর্তি, বৈচিত্র্য, সাধারণত জীবনে হররোজ যা জোটে না। আজকের স্ফূর্তির মধ্যে যে নষ্টামি বা ইতরতা যুক্ত হয়েছে, সেকালের গ্রাম্য জীবনে তার অনুপ্রবেশ তখনও ঘটেনি। আপন অন্তর্নিহিত সহজ সরল স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকেই তারা আনন্দোৎসব বলে জানতো। আনন্দোৎসবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণ থাকলেও প্রকাশ ভঙ্গিমায়, রং-বৈভবে সেগুলো আলাদা ছিল। নৌকা সবদেশেই তো জলযান— কিন্তু বার্মার নৌকা আর বাংলাদেশের নৌকা একরকম নয়। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা সবই উপাসনালয়। কিন্তু ধর্মভেদে, রুচিবোধ পরিবর্তনের কারণে, এদের

www.icsbook.info

গঠনপ্রণালী আলাদা ধরনের। মেলার প্রকাশভঙ্গিও আপন আপন ধর্মের মঙ্গলবোধ ও শ্রেয়বোধ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হতো। মেলা বা উৎসব ঠিক ধর্মীয় না হয়ে উঠলেও সেগুলোতে ধর্মীয় নিষ্ঠার ছাপ থাকতো। যেমন এইসব মেলা বা উৎসব-অনুষ্ঠানে হিন্দুরা ধূতি পরতো, মুসলমানেরা পরতো লুঙ্গি বা পাজামা-পাঞ্জাবী। হিন্দু এয়োতী মেয়েরা মাথায় ঘোমটা না দিলেও মুসলমান বাড়ীর মেয়েরা পর্দা সহকারেই মেলায় আসতো। নতুন বছর বা নববর্ষ ছিল হালখাতার দিন। পুরনো দিনের হাতে নতুন দিনের রাখীবন্ধনের দিন। নতুন বছরে শুভ কামনার দিন। এই দিনে মুসলমান বাড়ীতে মিলাদ হত, গোলাপ পানি ছিটানো হত, সেমাই-ফিরনী রান্না হত, আগরবাতি জ্বালানো হত, হিন্দু বাড়ীতে গোবর লেপা, ধূপ জ্বালানো, শংখধ্বনি ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন দিনের আবাহন হত। মেলাগুলোর বিকিকিনির মধ্যেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যেত। যেমন— শাঁখা, লোহা, আলতা, সিঁদুরের পাশাপাশি সুর্মা, রেহেল, রঙীন খড়ম, ছহি নামাজ শিক্ষা কিংবা মুর্শিদী গানের বই বিক্রি হত। মনসুরী, কদমা, মন্ডা, মিঠাই, তসবী, তুলসীর মালা পাশাপাশি অবস্থান করতো। মেলা ছিল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বহতা মানুষের ঢল। মেলা ছিল মিলনের পীঠস্থান। এর স্থান-মাহাত্ম্য মলিন হতে দেয়া হত না। অর্থাৎ বিশেষ এক রিচ্যুয়াল অথচ সংহত জীবনবোধের যাপনগত বিভঙ্গকে বলা হত মেলা।

আজ মেলার চরিত্র ও চালচিত্র দুই-ই বদলে গেছে। বদলে গেছে মেলার উদ্দেশ্য ও স্বরূপটি। এখন মেলা মানেই জুয়া, হাওজি, নীল ছবি, অশ্লীল নাচ, যুবক-যুবতীর খোলামেলা বিহার। কবে থেকে এই পচনের শুরু তার হিসাব নিলে দেখা যাবে, অবক্ষয়ের সুচনা সেই দিনই, যেদিন এসেছিল ইংরেজ। সাথে সৃষ্টি করেছিল তাদেরই উচ্ছিষ্টভোজী শ্রমবিমুখ বিলাসী একদল জমিদার শ্রেণী। যেদিন গ্রাম্য সমাজ, গ্রাম্য অর্থনীতি এবং জনগণের জীবনযাপনের উপায়সমূহকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। সেদিন থেকে মেলার চরিত্র বদল শুরু হয়েছে। মেলা জমিদার বাবুদের বারবনিতা বিলাস আর অর্থলাভের আখড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী তার "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" বইতে জমিদার বাবুদের মেলার চেহারা বদলের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, "খড় দহের ও ঘোষ পাড়ার মেলা ও মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতি সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গনাদের লইয়া দলে দলে নৌকা যোগে আমোদ করিতে যাইত।" ধীরেন্দ্র কুমার রায়ের পল্লী চিত্র বইতে পাওয়া যায়,"বারবিলাসিনীদের 'দোকান' এ অঞ্চলের মেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মেলায় ইহাদের সমাগম যত অধিক হয়, জমিদারদের লাভও তত অধিক হইয়া থাকে।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে জমিদার বাবুদের আগমনেই মঙ্গলবোধের মেলা গ্রাম্য যুবকদের যৌনতার দীক্ষা ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল।

www.icsbook.info

সংহত গ্রামীণ সমাজের শান্ত পরিকাঠামোটি ধ্বংস করে নির্লজ্জতার বেসাতি যারা শুরু করেছিলেন সেই জমিদার শ্রেণীটি আজ নেই, কিন্তু রয়ে গেছে তাদেরই হরিহর ছত্রের আশ্রয়ভোগী একদল লুম্পেন, যারা উচ্চাশার অবিরাম তাড়নায় উদ্বেল হয়ে মানবিক গুণাবলী ও শুভবুদ্ধিকে খুইয়ে বসেছে।

গ্রামীণ জীবন এখন দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত। দৈহিক শ্রম বিক্রি করে যারা বেঁচে আছে, তাদের জীবনে আজ উৎসব নেই, মেলা নেই, কোলাহল নেই। সব মেলা উঠে এসেছে কিছু বিত্তবানের ঘরে। হাটের, মাঠের মেলা এখন জায়গা নিয়েছে রমনার বটমূলে, বাংলা একাডেমী চত্বরে নয়তো কোন পাঁচতারা হোটেলে। গ্রামীণ জনপদে এখন নববর্ষ আসে না, হালখাতা নেই, বসন্তোৎসব দেখা যায় না। সব বসন্তোৎসব, নববর্ষ উৎসব উঠে এসেছে শহরে। শহরে একবার নয় বছরে দু'বার নববর্ষ পালিত হয়। সেই নববর্ষ আসে কিছু উচ্চবিত্ত মানুষের গাড়ী মিছিলের হর্নের কান ফাটা উচ্চ শব্দে। সেই নববর্ষ আসে বানর, শূকর, হনুমান চিত্রিত মুখোশধারী কিছু মানুষের নৃত্য গীতে, ধূতি, শাঁখ, ঢোল-ঢক্কড় আর উলুধ্বনির শব্দে। সে নববর্ষ আসে কামিনীর হাতে পান্তা খাওয়ার উষ্ণ পরশে। নববর্ষ আসে পাঁচতারা হোটেলের বলরুমে রঙীন পানীয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে যাওয়া কিছু তরুণ-তরুণীর রাতভর উদোম নৃত্যে— অথবা বিদেশী সুরের তালে তালে স্খলিত যৌবনা বয়সী পুরুষ-রমণীর ধাপুস-ধুপুস নৃত্য ও বেলেল্লাপনায়। নববর্ষ আসে একদল মানুষের আদিম কায়দায় জঙ্গল নিশি উদযাপনের আদিমতায়। এই হচ্ছে মেলা নামক মেলামেশার বর্তমান রূপ। 'মেলায়' এখন আর আগের দেশ-কাল নেই, আগের সেই রীতিনীতির বালাই নেই। বর্তমান মেলার চেহারা দেখে মনেই হয় না এই হতভাগ্য দেশটিতে মানবতাবাদী ইসলাম ধর্ম কোনদিন সৎ জীবনযাপনের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধের বাণী বহন করে এনেছিল।

জাতিগত অবক্ষয় এবং সর্বাঙ্গে অদৃশ্য পচনে মেলার চালচিত্র পাল্টে গেছে। মেলা এখন সর্বজনীন আনন্দ-পিপাসু আত্মাকে উদ্বেলিত করে না। মেলা এখন গ্রামীণ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শহুরে হুজুগ-সর্বস্ব কিছু মানুষের নিজেকে জাহির করার বাসনায় খণ্ডিত হয়ে গেছে। মেলার অন্তর্মূলে এখন নিদারুণ অন্ধকার, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্য বিকৃতির লক্ষণ। গ্রাম-গঞ্জের খেটে খাওয়া মানুষগুলোর দুঃখের সান্ত্বনা, আনন্দ-উচ্ছ্বাস, বঞ্চনায় বুক বেঁধে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা কোন কিছুই এসব মেলাতে নেই। এ মেলা শুধুই খ্যাপানদীর পাগলামির দাপট। কোথায় আমাদের ভাসিয়ে নেবে কে জানে!

১০.০৫.৯৬

www.icsbook.info

নিধুবনের বসন্ত উৎসব

বসন্তের সমাগমে, সবুজ বনস্থলীতে যমুনার তীরে, শতগোপীর মিলনমেলায়, শ্যামকৃষ্ণ রঙে রঙীন হয়ে উল্লাস করছে গোপিনীর দল— 'রঙদে চুনারিয়া' এটাই ফাগুয়া বা হোলি উৎসব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরই নাম দিয়েছিলেন বসন্তোৎসব।

ফাগুয়া বা দোল যাত্রা হিন্দুদের অতি প্রাচীন একটি উৎসব। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রম' গ্রন্থে বর্ণিত 'হোলকা' উৎসব, হিন্দু সমাজের দীর্ঘদিনের প্রচলিত হোলি, দোল, ফাগ বা ফাগুয়া, শান্তি নিকেতন আশ্রমে এসে হয়েছিল বসন্তোৎসব।

বসন্তোৎসব মূলত যুবক-যুবতীদের আনন্দোৎসব। ফাগুয়ার দিন যুবক-যুবতীরা বাঁধভাঙ্গা আনন্দে মেতে ওঠে। আজকাল যদিও গাছে গাছে রক্তাশোকের লালিমা, কোকিলের কুহুতান, দেহে দখিনার মৃদু উষ্ণ স্পর্শ পাওয়া যায় না— তবু আধুনিক যুবক-যুবতীরা মনের দিক থেকে নিজেদের কৃষ্ণ গোপিনী ভাবতে কসুর করে না। প্রকৃতি হিজল, রক্তপলাশের সাজে না সাজলেও তরুণ-তরুণীদের রক্ত ঠিকই নেচে ওঠে, উত্তপ্ত হয়; উদ্দাম বাদ্যের সাথে 'ছ্যারা র রা' চিৎকার করে, একে অপরের গায়ে রঙের পিচকারি মেরে এবং দোঁহে দোঁহার বিভিন্ন অঙ্গে আবীর বা ফাগের রঙ মাখিয়ে তারা আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে কামদাহ নিভানোর জন্য শরীরে কাদামাটি মেখে কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করেও পরিতৃপ্ত হয়। এরই নাম হোলি বা বসন্তোৎসব।

হোলি বা বসন্তোৎসব নিছকই একটা আনন্দোৎসব। হিন্দুদের 'লিঙ্গ পুরাণে' এই উৎসবের নাম দেয়া হয়েছে— 'ফালগুনিকী'। সেখানে বলা হয়েছে- "ফালগুনিকী বাল বিলাসিনী জেয়া" অর্থাৎ লোকরঞ্জনের জন্য এটা করণীয়। এই অনুষ্ঠানে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ তুচ্ছ হয়ে যায়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রুচির সীমানাও লংঘিত হয়।

বসন্তোৎসবের সাথে মদন উৎসবের একটা যোগ আছে। কবি কালিদাস বলেছিলেন, "বসন্ত সমাগমে বণ্যপ্রাণী জগতেও কামের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।" চিতং মুনেরপি হরন্তি নিবৃত্ত রাগং'। মুনি ঋষিরই যখন চিত্তবিভ্রম ঘটে, তখন সাধারণ মানুষের মন তো কামচঞ্চল হবেই। সেই কামচঞ্চল হৃদয়ের টানে টিএসসি, বকুলতলা কিংবা রমনাকে যমুনা তীরের মধুকুঞ্জ ভেবে রঙ-পিচকারি হাতে তারাতো ছুটে যাবেই। আবীর ফাগ এদেশে দুস্প্রাপ্য হলে, ভালে সিঁদুর এঁকে পরকীয়া প্রেম জ্বালা নিভাবে।

কবি ভারত চন্দ্র রায় বলেছেন—

> "বারো মাস মধ্যে মাস বিষম ফাগুন,
> মলয় পবন জ্বালে বিরহ আগুন।"

www.icsbook.info

এই বিরহ আগুন নিভাতেই তো তারা ছ্যারারারা উল্লাসে নিতম্ব-পয়োধরে রঙিন পানির পিচকারি মারে। মলয় পবনের বিরহ জ্বালা শুধু যুবক-যুবতীদেরই প্রেমের নিধুবনে ডাক দেয় না, স্খলিত যৌবন বৃদ্ধকেও মদনের টানে টেনে নিয়ে যায় কুমারীর রাখী বাঁধার পরশ লোভাতুর করে। তাই দোল বা বসন্ত উৎসব মূলত মদনদগ্ধ মানুষেরই উৎসব। হিন্দুদের পুরাণেও এই উৎসবকে 'মদনদাহ' বা 'কামদাহের' সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

ঐতিহাসিক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাসাম সাহেবের লেখা কলিকাতার দোলের ইতিহাস তুলে লিখেছেন— ফাগুয়ার তত্ত্বটি ছিল 'ইউনিভার্সাল মেরি মেকিং এ্যান্ড লাইসেন্স অব অলকাইন্ড' অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাধা-বন্ধনহীন সার্বিক আনন্দ-উল্লাসের ছাড়পত্র। ঐতিহাসিক বাসাম সাহেব হোলি উৎসবকে প্রাচীন গ্রীসের 'স্যাটারনালিয়া' উৎসবের সাথে মিলিয়ে দিয়ে বলেছেন, "এটি হিন্দু স্যাটারনালিয়া।"

ফাগুয়া হোলি বা বসন্তোৎসব সম্পর্কে একই কথা বলেছেন কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা'র লেখক শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি লিখেছেন— 'স্যাটারনালিয়া' মদনোৎসব উপলক্ষে রোমান পুরুষেরা উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় ছুটোছুটি করার নৈতিক অধিকার পেতেন। তাদের অবাধ আদিমতা সমাজের চোখে কোন রকমেই অপরাধ বলে গণ্য হত না। বরং তাদের এই বেপরোয়া মাতলামি আর নোংরামি সকলে পছন্দ করতেন। প্রিয়ার পদাঘাতে অশোককুঞ্জ যেমন একদা এদেশে মঞ্জুরিত হয়ে উঠতো, মাতাল উলঙ্গ রোমান যুবকদের দ্বারা তেমনি বন্ধ্যা রমণীরা হতেন সন্তান সম্ভবা। বন্ধ্যাত্ব কেটে যেত। আমাদের হোলিকে এতখানি প্রশ্রয় না দিলেও অবাধ স্ফূর্তির ছাড়পত্র তাকে দেয়া হয়েছিল এবং এই ছাড়পত্র ছিল বলেই উৎসবটি নানা কারণে 'সেকুউলার' হয়ে উঠেছিল।"

শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়— হিন্দু 'স্যাটারনালিয়া' নামক হোলি উৎসব অসংযত স্ফূর্তি ও আমেজে জমে ওঠে বলেই বাংলাদেশের সেকুউলারিস্টরাও এই ধরনের বসন্ত উৎসব উদযাপনে জমতে মজা পান। শুধু বসন্তোৎসবেই নয়, থার্টিফাস্ট নাইট, ভ্যালেনটাইন ডে, রাখীবন্ধন প্রভৃতি বিজাতীয় কর্মক্রীড়া উৎসব আয়োজনের মধ্যেও তারা একই মজা চেখে বেড়ান। এসব বিজাতীয় আনন্দোৎসবের একমাত্র উদ্দেশ্যই হল মজা কর, কেবল মজা কর। আহার-নিদ্রা মৈথুন আদর্শে বিশ্বাসী সেকালের বাবু শ্রেণীটির মতো এই মুসলমান নামধারী কতিপয় সেকুউলারিস্টেরও দর্শন হলো মজা কর, শুধু মজা কর। তারাও বিশ্বাস করেন, "চিরকাল লেখাপড়া লেখাপড়া করিয়া মরিলেই বা কি হইবেক? তাহাতে দ্বিভুজ ঘুচিয়া কি কেহ চতুর্ভুজ হইয়াছে? বাবাজী চক্ষু মুদিয়া দেখ, কে কাহার। এই সকল বাটি, ঘর-দরজা, টাকা-কড়ি কে কোথায়

www.icsbook.info

থাকিবেক? মরিয়া গেলে দুই কাচা মাত্র সঙ্গে দিয়া বিদায় করিবেক। অতএব বাবাজী এই সংসার মজার ব্যাপার। যদি মজা করিতে পার, তবে তাহাই থাকিবেক। মরিয়া গেলে এয়ার ও রাঁড়— ইহারাই নাম করিবেক, আর কহিবেক অমুক বড় মজাদার লোক ছিল।" বাংলাদেশের সেকুউলারিস্টরাও বসন্ত উৎসব, রাখীবন্ধন উৎসব, ভ্যালেনটাইন ডে, থার্টিফাস্ট নাইট প্রভৃতি আমোদ-উল্লাস পালনের মধ্য দিয়ে সেই রকম মজার লোক হিসেবে বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। অতএব পরকালেরও ভয় নাই। মৃত্যুতেই যখন মৃত্যু, তখন এয়ার-রাঁড়দের মধ্যে বেঁচে থাকাটাই বা কম কি।

প্রশ্ন হলো— তারা যেখানে খুশী বেঁচে থাকুন গিয়ে। কিন্তু তাদের এই মদনক্রীড়া সমগ্র সমাজে উন্মত্ততা, উচ্ছৃংখলতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানের যথেচ্ছা তার গোটা সমাজকে কলুষিত করছে। বায়ুদূষণের মত সমাজে দূষণ ছড়াচ্ছে। সুতরাং এই ধরনের দূষণক্রিয়া নিয়ে জাতিকে ভাবতে হবে বৈকি। অনৈতিকতা মোমের সুতার মত শেষ না করে নিভে না।

যারা শান্তিনিকেতন স্টাইলে এদেশে হোলি উৎসবের মত রং পিচকারি নিয়ে বসন্তোৎসবে মেতেছেন, তাদের জানা উচিত যে, তাদের গুরুদেবের মত পার্সোন্যালিটিও শান্তিনিকেতন চত্বরে বসন্তোৎসব নামক দোল উৎসবকে উচ্ছৃংখলতার হাত থেকে মুক্ত রাখতে পারেনি। বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী শ্রী শান্তিদেব ঘোষ তার 'শান্তি নিকেতনের বসন্তোৎসব' প্রবন্ধে লিখেছেন— "দু'তিন রঙের জল, বালতি বা টিনে ভর্তি করে এনে পিচকিরির সাহায্যে পরস্পরের গায়ে ছোঁড়া হতো। অনেকে পাকা রঙেরও ব্যবস্থা করতো যা জামা-কাপড় থেকে সহজে উঠতো না। অতিউৎসাহী কিছু ছাত্র কখনো কখনো কালো কালি ও আলকাতরা যে ব্যবহার করতো না, তাও নয়। সকালের এই অনুষ্ঠানে গুরুদেব আম্রকুঞ্জে নিজে কখনও থাকতেন না।" শ্রী শান্তি দেব ঘোষ বলেছেন, কাঁচা-পাকা নানা রং মাখানো খেলায় শিষ্টতার বা রুচিবোধের অভাব লক্ষ্য করেই গুরুদেব সকালের অনুষ্ঠানে নিজে থাকতেন না। যে বসন্তোৎসব শান্তিনিকেতনে সুশৃঙ্খলভাবে করা সম্ভব হয়নি, সেই লাগামহীন আনন্দোৎসব প্রথা এদেশে চালু করা হচ্ছে সমাজে, কোন্ শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার আশায়?

যে আচরণ নারী-পুরুষকে নির্লজ্জ কাজে উদ্বুদ্ধ করে, যে উৎসব নারী-পুরুষকে নৈতিক পতনের মুখে নিয়ে যায়, সেই আচরণ, সেই আনন্দোৎসব ইসলামে শক্তভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তো এ কারণেই। ইসলাম প্রবৃত্তির দাসত্ববৃত্তিকে এ কারণেই অনুমোদন দেয়নি।

www.icsbook.info

ইসলাম বলছে, মানব জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত উন্নতি এবং প্রগতি। বল্গাহীন কামনা চরিতার্থ করার নেশা পেয়ে বসলে ব্যক্তি জীবনে যেমন উন্নতি ও প্রগতি ব্যাহত হয়, জাতীয় জীবনেও তেমনি। ভোগসর্বস্ব জীবন যেমন জীবনীশক্তির অপচয় ঘটায়, উলঙ্গ সংস্কৃতিও তেমনি সমাজকে পাশবিক জীবনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যার আলামত আজ সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত। আত্মার পরিশুদ্ধি এবং সমাজকে সুনিয়ন্ত্রিত করার ঐকতানের নামই ইসলাম। সেই ইসলামকে জীবন থেকে বাদ দিয়ে যারা এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশে বৈদান্তিক নৈতিকতাবর্জিত, মনুষ্য চরিত্র ধ্বংসকারী সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্যের উলঙ্গ উচ্ছৃংখল সংস্কৃতির ধারক দোল, হোলি, রাখী, ভ্যালেনটাইন ডে, থার্টিফাস্ট নাইট ইত্যাদি উদযাপনে ব্রতী হয়েছেন— তাদের নিয়ে এখনই ভাবতে হবে। বাংলাদেশ ৮৬ ভাগ মুসলমানের দেশ। এদেশের সংখ্যাগুরু মানুষের সংস্কৃতির মূলনীতি অবতারবাদী এবং ভোগবাদীদের সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আমাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ভিত্তির সাথে ওদের মতবাদ প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিবাদমান এবং সাংঘর্ষিক। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের দুটি মর্যাদার মধ্যে বাংলাদেশের মানুষকে আজ একটি বেছে নিতে হবে— হয় সে মুসলমান, নয়তো অমুসলমান বা কাফির। এর মাঝামাঝি অবস্থান গ্রহণের আর কোন পথ নেই। সুতরাং নিধুবনের বসন্তোৎসব পালনকারীদের পরিচয় আজই নির্ণীত হওয়া দরকার।

২৫.০২.৯৯

www.icsbook.info

ঈদ সংস্কৃতি

ঈদ অর্থ আনন্দ উৎসব। দীর্ঘ একমাস সংযম সাধনার পর, কৃচ্ছ্র সাধনার পর, দিনে নিরম্বু উপবাস, রাত্রে ইবাদত— এইভাবে ইন্দ্রিয়গুলোকে এক মাস শৃঙ্খলিত রাখার পর ঈদ নিয়ে আসে মুক্তির আশ্বাস। কঠোর অধ্যয়নের পর পরীক্ষা পাসের আনন্দ যেমন গলা ফাটানো উল্লাস নিয়ে ফেটে পড়ে, ঈদের একফালি বাঁকা চাঁদও তেমনি গলা ফাটানো খুশির সওগাত বয়ে আনে প্রতিটি মানুষের ঘরে। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাই গেয়েছেন, "ওগো কাল সাঁজে দ্বিতীয়া চাঁদের ইশারা কোন/মুজদা এনেছে, সুখে ডগমগ মুকুলী মন/আশাবরী সুরে ঝুরে সানাই। /আতর সুভাসে কাতর হলো গো পাথর দিল, /দিলে দিলে আজ বন্ধকী দেনা নাই দলিল /কবুলিয়তের নাই বালাই।" ঈদ শুধু আনন্দ নয়, ঈদ উল্লাস। যে সমাজে আনন্দ-উল্লাস নেই, সে সমাজ শুধু বৃদ্ধ নয়, একেবারে অসুস্থ। সাধারণত ঈদ নিয়ে যেসব আলোচনা, লেখালেখি হতে দেখা যায়, তাতে ঈদকে রোযার সাথে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়।

ঈদের থিসিস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে অনেকে ত্যাগের কথা বলেন, কৃচ্ছ্র সাধনের কথা বলেন। এগুলো রমজানের কথা, ঈদের কথা নয়। জনাব আবুল মনসুর আহমদ ঈদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, "রোজা ও ঈদ, ত্যাগ ও ভোগের মতই দুইটা এন্টি থিসিস, বিপরীত গুণাত্মক কাজ। রমজানের বেলা একটা শর্ত আর একটা পুরস্কার। একটা ক্রিয়া আর একটা ফল। শ্রমের পুরস্কার যেমন ভোগ, রমজানের রোযার পুরস্কার তেমনি ঈদুল ফিতর। আমরা দুইটাকে এক করিয়া ফেলিয়াছি।"

এই এক করে ফেলার কারণে মুসলমানদের আনন্দ উৎসব যে আছে, মুসলমানরা যে আনন্দ করতে জানে, সেসব কথা মনেই হয় না। আমাদের মিডিয়াগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলে আনন্দের অভাবটা আরও প্রকটভাবে ধরা পড়বে। ঈদের অনুষ্ঠানের নামে আমাদের টেলিভিশনে ঈদের দিনে যেসব অনুষ্ঠান প্রচার করতে দেখা যায়, সেগুলো না হয় ঈদের অনুষ্ঠান, না হয় আনন্দের। 'না ঘরকা না ঘাটকা' মার্কা অনুষ্ঠানের কারণই হলো আমরা ইবাদত ও উৎসবকে এক করে ফেলেছি। ফলে, মুসলমানদের আনন্দের এক্সপ্রেশন বা বহিঃপ্রকাশই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

১৭৫৭-এর পলাশী যুদ্ধের পর বাংলার মুসলমানরা শুধু রাজ্যহারা হয়ে ভিখারির জাতে পরিণত হয়নি— সাংস্কৃতিক দিক থেকে এমনকি আনন্দ উৎসবের দিক থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। ইংরেজদের জুলুমবাজির বিরুদ্ধে দু'শ' বছর ধরে তাদের যে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, তার ফলে তারা পিউরিটান সাজতে বাধ্য হয়েছিল।

www.icsbook.info

নেতৃবৃন্দ বলেছিলেন, আনন্দ উল্লাস বর্জন কর, সংগীত, থিয়েটার, কৌতুক, খেলাধুলা প্রভৃতি নিষিদ্ধ বা হারাম জ্ঞানে পরিত্যাগ কর। ঈদের দিনের উৎসব শুধু ইবাদত ও মোনাজাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সংক্ষিপ্ত কর। সময়ের পরিবর্তন হলো কিন্তু বাংলার মুসলমানদের সেই পিউরিটানিস্ট মনোভাবের আর পরিবর্তন হল না। যে মুসলমানরা তাওহীদের অমিয় বাণীর সাথে বয়ে এনেছিল সুমধুর সুররাজি, নানান বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর ঝংকার, উন্নত ফ্যাশনের পোশাক-পরিচ্ছদ, নানান মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী, কুস্তি, বল খেলা, বাঘের সাথে যুদ্ধ, সাঁতার, লাঠিখেলা, অসিচালনা, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি সাহসিকতাপূর্ণ খেলাধুলা— তাদের জীবন থেকে সব আনন্দ উৎসব মুছে গিয়ে পড়ে থাকল শুধু কৃচ্ছ্র সাধনের কথা, ইবাদতের আর পরকালের সুখের কথা। তারা ভুলে গেল, মানুষ আনন্দ করতে পারলে, মন ছুটি পায়, নতুন চিন্তা করতে পারে। তারা ভুলে গেল যে জাতির আনন্দ নেই, সে জাতি সুস্থ-সবল হয়ে গড়ে উঠতে পারে না।

ইসলাম অত্যন্ত বাস্তববাদী জীবন বিধান। ইসলাম মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে, তাদের ভাবধারার প্রতি সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই জীবন-বিধান তৈরী করেছে। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করে যেমন তার পানাহারের চাহিদা দিয়েছেন, তেমনি দিয়েছেন আনন্দ, স্ফূর্তি, উৎফুল্লচিন্তা, হাসি-তামাশা, খেলাধুলা করার প্রকৃতিগত ভাবধারা। ইসলাম মনুষ্য ভাবধারার এই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করেনি। ইসলাম মানুষকে ফেরেশ্‌তা মনে করে কর্ম বিধান দেয়নি, মানুষকে পৃথিবীর হাটে, মাঠে, ঘাটে বিচরণকারী মানুষ হিসেবেই দেখতে চেয়েছে। আমাদের প্রিয় নবীজী ফুল ভালবাসতেন, সুঘ্রাণ পছন্দ করতেন, হাসতেন, হাসাতেন, ঠাট্টা-মশকরা-রসিকতা করতেন, আনন্দ-স্ফূর্তি, হাসি-খুশি থাকা পছন্দ করতেন, কষ্ট-দুঃখ অপছন্দ করতেন। সকল খারাবী থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন। বলতেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই দুশ্চিন্তা ও দুঃখানুভূতি থেকে।

দেখা যাচ্ছে, ইসলাম আনন্দ-স্ফূর্তির পরিপন্থী কোন ধর্ম নয়। আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করা ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়নি। ইসলাম যৌবন ধর্মে বিশ্বাসী। তা হলে আমাদের ঈদের উৎসব শুধু দান-খয়রাত, দু'রাকাত নামায, খুতবা, কিছু যাকাতের কাপড় বিলানো, নতুন কাপড় পরে শুধু পুরুষদের বিভিন্ন মসজিদে জামাতে নামায পড়তে যাওয়া, ঘরে ফিরে সেমাই ফিরনী পোলাও গোশত খেয়ে আইঢাই করে ঘুমিয়ে পড়া, অথবা টেলিভিশন নামক যন্ত্রের সামনে বসে ইসলামী ভাবধারার পরিপন্থী কিছু অনুষ্ঠান উপভোগ করাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেল কেন? এর নামই কি ঈদ উৎসব? এটাই কি আমাদের ঈদ সংস্কৃতি? ঈদ উৎসবে পেটের ক্ষুধা মিটলেও মনের ক্ষুধা মিটানোর মত কোন ব্যবস্থাই নেই কেন? ঈদ উৎসবে দেহে আনন্দের শিহরণ সৃষ্টিকারী, মনে স্পন্দন

www.icsbook.info

সৃষ্টিকারী, হৃদয়ে গভীর রেখাপাতকারী কোন অনুষ্ঠানাদি নেই কেন? মুসলমানদের ঈদ উৎসব এমন গতানুগতিক প্রাণহীন উৎসব কেন?

ঈদ কি চিরকালই এমন প্রাণহীন উৎসব ছিল? চলুন না অতীতের ঈদ উৎসবের দিকে একবার নজর করে দেখা যাক। বাহারীস্তান-ই গায়েবীর লেখক মীর্জা নাথন সে যুগের ঈদ উৎসব সম্বন্ধে লিখেছেন— "খুব আমোদ-স্ফূর্তির সঙ্গে ঈদের নতুন চাঁদকে স্বাগত জানানো হত। দিনের শেষে সন্ধ্যা সমাগমে নতুন চাঁদ দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় নাকাড়া বেজে ওঠে এবং গোলন্দাজ সেনাদলের সকল আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ক্রমাগত তোপ দাগানো হত। রাত্রির শেষ ভাগে কামানের অগ্নুদ্গীরণ শেষ হওয়ার পর পর শোনা যায় ভারি কামানের আওয়াজ। এটা ছিল দস্তুর মত ভূমিকম্প।" বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের লেখক ডঃ এম.এ রহিম লিখেছেন, "ঈদের দিনে সমস্ত মুসলমান আনন্দ-স্ফূর্তিতে মশগুল থাকত। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা নির্বিশেষে প্রত্যেকে নতুন এবং উৎকৃষ্ট কাপড় পরিধান করত। চমৎকার পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে মুসলমানগণ প্রভাতে ঈদগাহ ময়দান বা ঈদের নামাজের স্থানে শোভাযাত্রা করে গমন করত।" 'নওবাহারী মুর্শিদকুলী খানী' গ্রন্থের লেখক আজাদ হোসেন বিলগ্রামীর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, "নবাব সুজাউদ্দীনের অধীনে ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা ঈদগাহ ময়দানের দিকে শোভাযাত্রা করে যাওয়ার সময় দুর্গ থেকে এক ক্রোশ পথে প্রচুর পরিমাণে টাকা-পয়সা ছড়িয়ে যেতেন।" মির্জা নাথন লিখেছেন, "দু-তিনদিন উৎসবাদি চলতে থাকে। এর সঙ্গে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের ব্যবস্থাও থাকে।"

এ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, অতীতের ঈদ উৎসব আজকের মত নিষ্প্রাণ ছিল না। সেদিন উৎসবের আয়োজন করত মুষ্টিমেয় ধনী লোকে কিন্তু সেই আনন্দ উপভোগ করত ধনী-গরীব, অন্য ধর্মের লোক নির্বিশেষে সকলেই। এভাবেই সেদিনের ঈদ উৎসব জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়ে যেত। মুসলমানরা জীবন্ত ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির অধিকারী। কোন পৌরাণিক কল্পকাহিনী তাদের ঐতিহ্য নয়।

মুসলমানদের খাওয়ার কথাই ধরা যাক। এই উপমহাদেশে মুসলমানরাই উৎকৃষ্ট আহার্য প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়েছে। আজকের কাচ্চি বিরিয়ানী, মোরগ পোলাও, তেহারী পোলাও, কাশ্মীরী পোলাও, ভুনা খিচুরী, হালিম, চৌকো পরোটা, মোগলাই পরোটা, খাস্তা পরোটা, কিমার পাসতা, নেহারি, শাহী রেজালা, গোশতের কোপ্তা, গরুর ভুনা, চাপ, কলিজাকারি, মুঠা কাবাব, মগজ কাবাব, দম কাবাব, টিকিয়া কাবাব, শামি কাবাব, বোটি কাবাব, কোফতা, কোরমা, তেন্দুরী মোরগ, মোরগ মোসোল্লাম, চিকেন কাটলেট, দুধের নামাস, বাখরখানি, পনির তেককা, গ্লাসি, নুনিয়া, বোরহানি, বউখুদী,

www.icsbook.info

দুধ চিতই, ফিরনী, ভাঁপা পিঠা, চৈপিঠা, নানান রকম চাটনী, সালাদসহ আরো বহু সুস্বাদু খাবার যার নাম শুনলেই জিভে পানি আসে, মুসলমানদেরই অবদান। এই সব উৎকৃষ্ট রন্ধন প্রণালী আমাদের সংস্কৃতি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ঈদ উপলক্ষে এই ধরনের খাদ্য মেলার প্রচলন করা যেতে পারে।

মুসলমানরা আসার আগে এই উপমহাদেশের মানুষ সেলাই করা কাপড় পরতে জানত না। মুসলমানরাই এদেশে উৎকৃষ্ট পোশাক প্রস্তুত প্রণালী আমদানি করেছিল। কামিজ, কুর্তা, চোগা, চাপকান, আচকান, শেরওয়ানী পাজামা, চুস্ত পাজামা, সালোয়ার, পিরায়ান, টুপী, পাগড়ী, ব্লাউজ, চোলি, খিলকা, পেশওয়াজ, আলখাল্লা, বোরকা, দোপাট্টা, ঘাগরা, ঝুলা, চোলিকা, লুঙ্গি, তফন শার্ট, বেনিয়ান, ফতুয়া, মেরজাই, দস্তানা কত রকমের বাহারি পোশাক। ঈদ সংস্কৃতিতে মুসলমানী পোশাকের ফ্যাশন শো করা যেতে পারে।

মুসলমানরাই এদেশে উৎকৃষ্ট সংগীতের প্রচলন করেছিল। খেয়াল, ঠুংরী, তারানা, দাদরা, সাদ্রো, টপ্পা, কাওয়ালী, হামদ, নাত, গজল, তবলা, ঢোল, ভেরি, নাকাড়া, সুরবাহার, সেতার, সারেঙ্গী, এস্রাজ, শাহনাই প্রভৃতি গান এবং বাদ্যযন্ত্র মুসলমানদেরই সৃষ্টি। ঈদ সংস্কৃতিতে, এই ধরনের মুসলমানদের সৃষ্ট সংগীত ধারা, রাগ রাগিণী এবং যন্ত্র সংগীতের আসর বাড়ীতে, পাড়ায়, মহল্লায় আয়োজন করলে আজও সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল গড়ে উঠতে পারে।

আমাদের নাট্যকারগণ ঈদের নাটক লেখার প্লট খুঁজে পান না বলে চোরা কারবার, ভেজাল মালের ব্যবসায়ী, কিশোর-কিশোরীর প্রেম উপাখ্যান নিয়ে ঈদের নাটক লিখে থাকেন। অথচ হযরত ইবরাহীমের স্বপ্ন, রাসূলে খোদার নবুয়ত, হিজরত, মেরাজ, মক্কা বিজয়, বদরের যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনাকে রূপক আকারে ব্যবহার করে অনেক উন্নত শিল্প সমৃদ্ধ ঈদের উপযোগী নাটক রচনা করা যায়। হযরত উমরের ন্যায়পরায়ণতা, হযরত আলীর বিচক্ষণ বিচার-বুদ্ধি, হাসান-হোসেনের ত্যাগ, মা-ফাতেমার সাহিত্যানুরাগ, কারবালার আত্মোৎসর্গকে উপজীব্য করেও অনেক উন্নত মানের নাট্য রচনা ঈদের অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে।

ঈদকে অফুরন্ত আনন্দ রসের আবেহায়াতে সঞ্জীবিত করার জন্য অতীতের মত একাধিক দিন ধরে ঈদ রি-ইউনিয়ন, ঈদ মেলা, ঈদ মিছিল, ঈদ জশন, ঈদ ফ্যাশান শো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোকসজ্জা, নাটক, উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র প্রদর্শন, শিশুমেলা, রন্ধন এবং খাদ্য মেলা, বিভিন্ন বীরত্বপূর্ণ খেলাধুলা, শারীরিক কসরত প্রদর্শন ইত্যাদির আয়োজন করে ঈদ সংস্কৃতির সুচারু আনন্দের প্রাণধারায় অপসংস্কৃতিকে ধুয়ে-মুছে

www.icsbook.info

রুচির সুস্থতা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এর জন্য চাই সুধীজনের আগ্রহ, উদ্যোগ এবং পৃষ্ঠপোষকতা।

মুসলমানদের বহু জিনিস আছে, যা অবহেলা অপরিচর্যার কারণে হারিয়ে যাচ্ছে। ঈদ আমাদের প্রধানতম ধর্মোৎসব। আর ধর্মোৎসবই হল জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের সবচাইতে উর্বর ক্ষেত্র। ধর্মোৎসবের নামে যে শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, কথকতা, কাব্য, নাটক, মেলা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক চর্চা হবে, সেগুলোইতো অন্য ধর্মের মানুষকে আকৃষ্ট করবে, এভাবেই ধর্মোৎসব জাতীয় উৎসবে রূপান্তরিত হবে। দুঃখের বিষয় ঈদ উৎসব আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সবচেয়ে উর্বর ক্ষেত্র হওয়া সত্ত্বেও আমাদের অনুৎসাহ এবং সৃজনী শক্তির অভাবে বন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে ঈদকে মুসলিম সংস্কৃতির প্রাণশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে ঈদকে রোযা ভাবলে চলবে না। ঈদকে উৎসব হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে— ইসলাম সীমালংঘন করাকে অনুমোদন দেয় না।

১৭.০১.৯৯

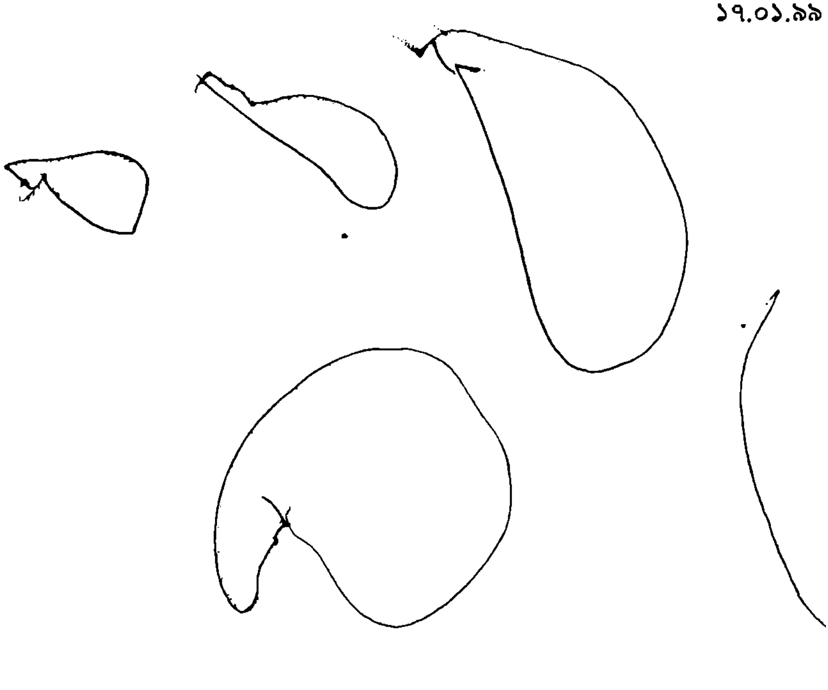

www.icsbook.info

আমাদের পরিচয়টা কি ?

একটি ছেলেকে নাম জিজ্ঞাসা করায় সে বললো 'সুমন'। বললাম, তোমার আব্বার নাম কি? ছেলেটি বললো, আজিমুদ্দিন। আমি বললাম, তোমার আব্বার নাম না শুনলে তো বুঝতেই পারতাম না তুমি হিন্দু না মুসলমান! ছেলেটি বললো আমি বাঙালী। বললাম, নিখুঁত বাংলা ভাষায় যখন কথা বলছো এখন অবশ্যই তুমি বাঙালী। কিন্তু হিন্দু বাঙালী না মুসলমান বাঙালী, নাম শুনে সেটাতো বোঝা গেলো না। তোমাকে নমস্কার করবো, না আসসালামু আলাইকুম জানিয়ে আহবান করবো নাম শুনে সেটাতো ঠিক করে উঠতে পারলাম না।

ছেলেটি বললো, আমি বাঙালী এই পরিচয়টিই কি বড় পরিচয় নয়? বললাম, ভাষাভিত্তিক পরিচয়ের পরেও তোমার আর একটা ভিন্ন পরিচয় আছে। আচ্ছা বলতো, তুমি যা খাও, সব বাঙালীই কি তা খায়? তুমি যে পোশাক পর সব বাঙালীই কি সেই পোশাক পরে? তোমার আম্মা যেভাবে রান্না করেন, সব বাঙালী মায়েরাই কি সেভাবে রান্না করেন? বিভিন্ন মেলা-পার্বণে তোমার বাড়ীতে, তোমার সমাজে যে সকল আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়, সব বাঙালী বাড়ী বা সমাজেই কি সেভাবে পালিত হয়? ছেলেটি একটু ভেবে বললো, না! তা হয় না।

আমি বললাম, এখানেই তোমার স্বাতন্ত্র্য, তোমার ভিন্নতা, তোমার আলাদা ট্রাডিশন, আলাদা কালচার, আলাদা জাতিসত্তা। এই আলাদা বা ভিন্ন আচরণই বলে দেয়, বাংলা ভাষায় কথা বললেও অন্য একটি সম্প্রদায়ের, অন্য একটি জাতির মানুষের সঙ্গে তোমার পরিচয় মিলে যাচ্ছে না। তুমি অন্য রকম, তোমার অন্য পরিচয় আছে। সুতরাং 'সুমন' নামটা যতই ফুলের মত শোভা বর্ধন করুক না কেন, তোমার স্বতন্ত্র পরিচয়টাকে আড়াল করে দেয়। চেনা যায় না তুমি কে? সে ক্ষেত্রে সগীর, শাব্বির, বা সরফরাজ নাম হলে আগেই সালামটা দিতে পারতাম।

আসলে দোষটা তোমার নয়। বর্তমানের আমরা এক প্রচন্ড ভয়াবহ দীনতা এবং সংকীর্ণতা রোগে আক্রান্ত হয়েছি। এর কারণ হলো হীনমন্যতা। বিগত তিন-চার শ' বছর ধরে আমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা তিরোহিত হয়েছে। নতুন উদ্ভাবন, নতুন আবিষ্কার, নতুন প্রযুক্তি কিংবা সমাজকে নতুন কিছু দিতে আমরা অক্ষম হয়ে পড়েছি।

বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, স্থাপত্যে, সংস্কৃতিতে, আর্টে, পেইন্টিংসএ আমাদের কলাবিদরা শোচনীয়ভাবে পিছনে পড়ে গেছে। যার ফলে বৈষয়িক অধঃপতনের সাথে সাথে আমাদের মানসিক অবনতিও এমনভাবে ঘটেছে যে, আমরা হীনমন্য হয়ে পড়েছি,

www.icsbook.info

মানসিক গোলামে পরিণত হয়েছি। এই মানসিক পরাধীনতা, ঐতিহ্যের স্রোতধারা থেকে আমাদের এমন বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে যে, অতীতের সব আলো নিভে গিয়ে আমরা বারবার রবীন্দ্র-বঙ্কিম ট্রাডিশনে লীন হতে চাইছি। কারণ, বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তায় ওরা আমাদের উপরে আছে। ওদের সমান হবার সাহস আমাদের নেই বলেই অন্য সমাজের মানুষ হলেও ওরা আমাদের কাছে অনুকরণীয় হয়ে আছে।

দু'শ' বছরের বৃটিশ শাসন বাংলার মুসলমান সমাজকে দুমড়ে-মুচড়ে নিঃশেষ করে ফেলেছিল। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এ্যরিসট্রোক্রাটিক বা অভিজাত সোসাইটি বলতে কিছু ছিল না। 'হান্টারে'র ভাষায়, বাঙালী মুসলমানেরা সকলেই পানির ভিস্তি এবং কাঠুরিয়া শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। নিদারুণ দুর্দশায় এদের অতীত মুছে গিয়েছিল। ফলে বাঙালী মুসলমানদের যে হীনমন্যতা বোধ এবং গোলামী স্বভাব জন্মলাভ করেছিল পাকিস্তানের ২৪ বছরে যেমন তা কাটেনি, বাংলাদেশের ২৭ বছরেও তেমনি তাকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। ফলে আমরা আমাদের স্বর্ণোজ্জ্বল অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি।

ঐতিহাসিক টয়েনবি সাহেব বলেছিলেন, সংস্কৃতি বা কালচারের এক আবর্তিত চক্র থাকে। যেমন, বর্তমান ইউরোপীয়ান কালচারের পিছনে আছে খৃস্টান কালচার। তারও পিছনে আছে গ্রীক বা রোমান কালচার। ইউরোপীয়ান কালচারকে বোঝা যাবে না, যদি না আমরা রোমান বা গ্রীক কালচারকে বোঝার চেষ্টা করি। তেমনি, মুসলিম কালচারও সেই মদীনা থেকে শুরু করে পৃথিবীর নানান দেশ ঘুরে বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং মুসলমান পরিচয় দিতে হলে মদীনা থেকে উৎসারিত সেই কালচার সার্কেল বা চক্রের মাধ্যমেই আমাদের পরিচয় খুঁজতে হবে। মদীনার কালচারাল সার্কেলেই আমাদের অবস্থান অনুসন্ধান করতে হবে। যতদিন তা পেরেছিলাম, ততদিন আমাদের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হয়েছিল। আজ নানান 'ইজম' এবং 'চেতনার' ঘোলা পানিতে আমাদের সেই 'কালচার সার্কেল' চাপা পড়ে গেছে। অথচ কিছুদিন আগেও গর্ব করে বলতাম, "মুসলমানদের স্বতন্ত্র কালচার আছে, ভিন্ন জাতিসত্তা আছে।" পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতেও লিখেছেন, "মুসলমানদের ঐক্যের একটা কারণ মুসলিম কালচার সম্পর্কে তাদের গর্ববোধ।" সেই গর্ববোধ আমাদের ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানরা আন্তর্জাতিক জাতি হলেও বাংলাদেশের মুসলমানরা এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। একটি কালচারাল দলের সদস্য হয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে গিয়েছিলাম। সেখানে বড় শখ করে ওরা ওদের পুরোনো রাজবাড়ী দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। বহু লোক দেখতে যায়। আমার মনে হয়েছিল আমাদের দেশের জমিদারদের কাচারী বাড়ীর স্থাপত্য শৈলীও ওর চাইতে অনেক মনোরম।

www.icsbook.info

আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর দেওয়ানই আম, দেওয়ানই খাস, কুতুব মিনার প্রভৃতির স্থাপত্য শৈলী দেখলে গর্বে বুকটা ভরে ওঠে না কার?— কিন্তু সে গর্বের অংশীদার আমরা হতে পারি না। কারণ, ওগুলো নাকি বহিরাগতদের সৃষ্টি।

১৩৮৯ থেকে ১৪০৯ খৃঃ পর্যন্ত গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের রাজত্বকালে শাহ মুহাম্মদ সগীর সাধারণ মুসলমানের ভাষা বাংলায় রচনা করেছিলেন তাঁর স্মরণীয় গ্রন্থ 'ইউসুফ জুলেখা'।

১৬ শতাব্দীতে আমাদের কবি সৈয়দ সুলতান, আলাওল প্রমুখ উন্নত বাংলা চর্চা করেছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধের কবি দৌলত উজির, বাহরাম খান পারস্যের প্রেমকাব্য 'লাইলী মজনু' বাংলায় অনুবাদ করে অমর হয়ে আছেন। সেদিন তারা যা পেরেছিলেন আজ আমরা তা পারছি না কেন?

ক্লাসিক্যাল সাহিত্য রচনার জন্য যেমন ক্লাসিক্যাল ভাষার প্রয়োজন হয়, তেমনি প্রয়োজন হয় সাংস্কৃতিক মূলধারার সাথে সম্পৃক্ততার। আমাদের সংস্কৃতির মূলধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে আরবী, ফারসী এবং উর্দু মারফত। শাহ মুহাম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, দৌলত উজির বা কাজী নজরুল ইসলাম যার নামই বলি না কেন, সকলেই আরবী, ফারসী এবং উর্দু চর্চা করতেন। আরবী, ফারসী এবং উর্দুর যে সাংস্কৃতিক ধারা তার থেকে বিচ্যুত হননি, যার ফলে তাদের পক্ষে মৌলিক বহু সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। আজ আমরা বাঙালী সাজতে গিয়ে সেই মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন বিচ্যুত হয়ে পড়েছি।

বিখ্যাত বাঙালী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজেকে নাস্তিক বলতেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে হিন্দুত্ববাদ এবং আদর্শ হিসেবে 'শ্রীকৃষ্ণ' দর্শন 'গীতা'কে তুলে ধরলেন। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'শ্রীকৃষ্ণ চরিত' ছিল শ্রীকৃষ্ণের জীবনী। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মূলধারা থেকে সরে যাননি। যাননি বলেই তিনি বড় মাপের লেখক হতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের হয়েও বেদান্ত অনুসরণে কাব্য চর্চা করেছেন। তিনিও হিন্দুত্বের মূলধারার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি।

পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রায়ই বলতেন, আমি ধর্মে বিশ্বাস করি না। কিন্তু তাঁর 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' পড়লে বোঝা যায়, তিনি সারা জীবন হিন্দু কালচারের আদি স্বরূপ সন্ধান করে গেছেন। হিন্দু কালচার বলতে তিনি সংস্কৃত কালচারকেই বুঝতেন।

সুতরাং দেখ! ওঁরা যার যার লাইনে ঠিকই আছেন। 'মুখে শেখ ফরিদ বগল মে ইট'। আমরাই শুধু বাংলা, বাঙালী প্রভৃতি মুখরোচক আবেগের ভাষা উত্থাপন করে নিজেদের ধর্ম, দর্শন, সাংস্কৃতিক মূলধারা এবং ইনটেলেকচ্যুয়াল বেস্ থেকে দূরে ছিটকে

www.icsbook.info

পড়েছি। যার ফলে কালোত্তীর্ণ কিছু চিন্তা করাও সম্ভব হচ্ছে না। নিদারুণ হতাশা এবং হীনমন্যতায় ভুগে ভুগে হীনবীর্য নতজানু স্বভাবের হয়ে পড়েছি। তাই 'সুমন' নাম নিয়ে তুমি গর্ব করছো। ভাবছো শমশের আলী আমার আপন নয়, ভিন্ন জাতের।

ইয়ং ম্যান! ভাবালুতা নয়, আবেগ নয়, বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন কর, তুমি কে? কে তোমার পিতা? কেন তাঁর নাম আজিমুদ্দিন? কেন তোমার মা-এর নাম জাহানারা? তোমার জীবন চর্চা এত ভিন্ন কেন? তোমার সামাজিক কাঠামো এমন আলাদা কেন? তোমার পরিচয় আলাদা কেন, তুমি এই আলাদা ভূমন্ডলের বাসিন্দা কেন? তোমার দেশের নাম বাংলাদেশ কেন? পশ্চিমবাংলা আর বাংলাদেশের মাঝে বেড়াটা কেন?

মনে রেখো! প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশই তার সংস্কৃতি। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বজায় রেখে চলতে না পারলে জাতি হিসেবে টিকে থাকা যায় না। জাতি হিসেবে টিকে থাকতে না পারলে দেশও থাকে না।

অতএব, প্রাথমিকভাবে তোমার নামই বলে দেবে কে তুমি? কি তোমার পরিচয়? তোমার ইনটেলেকচ্যুয়াল বেস কোথায়?

২৬.০১.৯৮

www.icsbook.info

আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি ?

এ আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি? মাথার উপরে ছায়া নেই, পায়ের নীচে মাটি নেই। বর্তমান অন্ধকার, অতীত কুয়াশাচ্ছন্ন, ভবিষ্যৎ বলে কিছু দেখা যাচ্ছে না। এ কেমন নির্জীব-নির্লিপ্ততা, এ কেমন অস্তিত্বহীনতা— যা আমাদের ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ, হীনবীর্য করে ফেলছে।

এমনটা তো ছিল না। এই আমরাই একদিন আমাদের স্বাতন্ত্র্য, আমাদের অস্মিতা, আমাদের অহংবোধ, আমাদের আত্মগৌরব, আমাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আগ্রাসী বৃটিশদের বিরুদ্ধে, শোষক জমিদার মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে, কুচক্রী হিন্দু রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে সমরে, সংগ্রামে, আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করতে কার্পণ্য করিনি। কখনও নিসার আলী হয়ে, কখনও হাজী শরীয়তুল্লাহ হয়ে, কখনও দুদুমিয়া হয়ে, কখনও মাসুম শাহ হয়ে, কখনও সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, কাজী মিয়াজান, হাবিলদার রজব আলী, পাগলা টিপু, মুন্সী মেহেরুল্লাহ হয়ে, জেল-জুলুম, ফাঁসি-গুলিতে বুক পেতে দিতে পিছপা হইনি। তবে আজ কেন সেই সব ত্যাগ-তিতিক্ষা, রক্তদান, আত্মোৎসর্গ অকিঞ্চিৎকর, অপ্রয়োজনীয় মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছে? কেন মনে হচ্ছে, আমরাতো এই সেদিন মাত্র জাতীয় জীবন শুরু করেছি? কেন মনে হচ্ছে আমরা বায়ান্ন কিংবা একাত্তরের প্রজন্ম? আমাদের অতীত এখান থেকেই শুরু।

গোটা জাতিটা যেন আবেগমন্ডিত হয়ে নেশাগ্রস্তের মত পথ হাঁটছে। যুক্তির আলো সে পথে ঢুকতে পারছে না। নিকটকে জানতে হলে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হয়, জাতি হিসেবে পরিচয় দিতে হলে ঐতিহ্যের আয়নায় নিজের মুখ দেখতে হয়। সে আয়না আমরা ধূলিমলিন করে রেখেছি। দূরের অতীত তমসাবৃত, চক্ষু জ্যোতিহীন হয়ে পড়েছে। তাই আত্মদর্শন সম্ভব হচ্ছে না।

কেন এমন হল? কেমন করে বিস্মৃত হলাম সেই বেদনাময় অতীত। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেই তো এই পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগুরু মুসলমানরা মেষ, ছাগল, হালের বলদের মত উৎপাদক শ্রেণীর জীব বলে গণ্য হত। তাদের দানাপানির দরকার আছে, শিক্ষা-দীক্ষার দরকার আছে, মানুষ হিসাবে বাঁচার অধিকার আছে— সেটুকুও স্বীকার করা হতো না। কলিকাতায় বসবাসকারী হিন্দু জমিদার বাবুদের বলগাহীন শোষণে অতিষ্ঠ ছিল এদেশের চাষা-ভুষা, ক্ষেতমজুর মুসলমানদের জীবন।

কেমন করে ভুলে গেলাম, কলিকাতার আরাম-আয়েশে বসবাসকারী ময়মনসিংহের জমিদার বাবু মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, গৌরিপুরের জমিদার বাবু মহারাজা ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, কাশিম বাজারের মহারাজা মনীন্দ্রনন্দী, জোড়াসাঁকোর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিঘাপাতিয়ার রাজা, নাটোরের রাজা, ফরিদপুরের সিকাদার

www.icsbook.info

ও ঘোষ পরিবারের মত অনেক বাবু-জমিদারদের ভয়াবহ অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য, এদেশের পদদলিত পাঁচু শেখ, গেঁদু মুন্সী, কালু মোড়ল, হাবু প্রামাণিক নামের মুসলমান সন্তানদের শোষণ মুক্ত করার জন্য শতাব্দীব্যাপী কতশত মানুষকে আত্মোৎসর্গ করতে হয়েছে? কেমন করে আমরা বিস্মৃত হলাম, গত শতাব্দীর মধ্যভাগেও এদেশে গরু কোরবানী করলে মুসলমানদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হত, দাড়ি রাখলে খাজনা দিতে হত, জুমার নামায নিষিদ্ধ ছিল, এমনকি মুসলমানদের আরবী-ফারসী শব্দে ভাল নাম রাখাও নিষিদ্ধ ছিল। কালিপূজা এবং দুর্গাপূজার কর দেয়া মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল।

আমরা কেমন করে বিস্মৃত হলাম, পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের কথা, যিনি তার জমিদারীতে হুকুম জারি করে ছিলেন— .."(১) যারা দাড়ি রাখিবে ও গোঁফ ছাঁটিবে তাদের প্রত্যেককে, ফি দাড়ির ওপর আড়াই টাকা, ফি গোঁফের ওপর পাঁচ সিকা খাজনা দিতে হইবে। (২) মসজিদ প্রস্তুত করিলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচশত টাকা ও প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা জমিদার সরকারে নজর দিতে হইবে। (৩) পিতা-পিতামহ আরবী নাম রাখিলে প্রত্যেক নামের জন্য পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হইবে। (৪) গোহত্যা করিলে হত্যাকারীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া নেয়া হইবে, যেন সে ব্যক্তি আর গোহত্যা করিতে না পারে। (বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ ঃ অমলেন্দু দে)

কেমন করে ভুলে গেলাম, তাদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, দুদুমিয়া, নোয়ামিয়া, আমিনুল্লাহ, মালদহের ওয়াহাবী নেতা মৌলবী আমিরুদ্দিন, রাজমহল মামলায় যাবজ্জীবন নির্বাসন দন্ডপ্রাপ্ত ইব্রাহীম মন্ডলসহ শত শত সংগ্রামী কি সুকঠিন, দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে, চাকরি-বাকরি পাবে, উকিল মোক্তার হবে, আইন সভার সদস্য হয়ে বাবু-জমিদারদের সাথে এক আসনে বসবে, শুধু মাত্র এই কারণে সেদিনের ভাষায় বাঙালী, চলনে-বলনে বাঙালী বাবুরা বঙ্গভঙ্গকে মেনে নিতে পারেনি। শুধু সাধারণ হিন্দু বাবুরাই নয়, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বলে পরিচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশ্ববরেণ্য কবিও বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য মিছিল নিয়ে পথে নেমেছিলেন। ইতিহাস বলছে, ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর, অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দিন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি অসংখ্য পথচারীর হাতে নিজে রাখী বেঁধে দিয়ে তাদেরকে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। শুধু অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, বিপিন পাল, অশ্বিনীদত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, সূর্যসেন, বাঘা যতীন, প্রীতিলতা প্রমুখের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা এবং বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক প্রমুখের প্ররোচনায় সৃষ্ট সারা দেশজুড়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বৃটিশ

www.icsbook.info

রাজশক্তিকে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য করেছিল। ভারতের বিখ্যাত কমুনিস্ট নেতা কমরেড মুজাফর আহমদ তাঁর 'সমকালের কথা' পুস্তকে লিখেছেন- "সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের আন্দোলন শুধু হিন্দু আন্দোলন ছিল না, আসলে তা ছিল বর্ণ-হিন্দুদের আন্দোলন।" প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই বঙ্গভঙ্গ রদকারী সূর্যসেন, প্রীতিলতা প্রমুখরা মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য সন্ত্রাসী তৎপরতা পরিচালনা করেছিলেন। আজ স্বাধীন বাংলাদেশের মুসলমানরা সেই সন্ত্রাসী সূর্যসেন, প্রীতিলতার নামেই দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের ছাত্রাবাসগুলোর নামকরণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে।

কেমন করে ভুলে গেলাম, সেদিনের কথা, যেদিন এই পূর্ববঙ্গ-আসামের ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল এলাকার তিন কোটি ১০ লক্ষ মানুষের জন্য মাত্র ১১টি কলেজ ছিল, মেয়েদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল তিনটি এবং এম. এ পড়ার জন্য কোন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের বিশাল জমিদারীর ৮০ ভাগ আয়ের যোগানদার ছিল এই দেশের যশোর, পাবনা, রাজশাহী অঞ্চলের মানুষ। তিনি এদেশে একাধিক কুঠিবাড়ী নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রাইমারী স্কুল, এমনকি এদেশের মানুষের সুবিধার জন্য একটা পুল বা কালভার্টও নির্মাণ করেননি। অথচ এদেশের মানুষের ঘামের-রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পয়সায় তিনি হিন্দু অধ্যুষিত বোলপুরের বিরান অঞ্চলে শান্তিনিকেতন নামক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলেছিলেন। ১৯১২ খৃঃ লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় আসার পর নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ যখন এদেশের মানুষের লেখাপড়ার জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানালেন, তখনও বাঙালী এলিটগণ তার বিরোধিতা করলেন। বাবু শ্রীশচন্দ্র ব্যানার্জী, স্যার রাজবিহারী ঘোষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি স্যার আশুতোষ মুখার্জির মত বিদ্বজ্জনেরা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে ১৮ বার স্মারকলিপি দিয়ে চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯১২ খৃঃ ২৮ শে মার্চ কলিকাতা গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে যে জনসভা হয়েছিল, সেই হিন্দু জনসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেছিলেন। অপরদিকে নবাব সলিমুল্লাহ, যিনি তার জমিদারীর বিরাট অংশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় দান করেছিলেন, যে সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী নিজ জমিদারী বন্ধক রেখে সে যুগে ১৯২১ সালে ৩৫ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে দান করেছিলেন, তাদের কথা স্মরণেও আসে না আজ।

আমরা কেমন করে বিস্মৃত হলাম, আজ থেকে মাত্র ৪৯ বছর আগে ১৯৪৭ সালের দিকে এই হাড়জিরজিরে বাঙালী মুসলমান অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলে দেশ রক্ষার জন্য সেনাবাহিনী গঠন করার মত লোক ছিল না। '৪৭ সালে বৃটিশ আর্মিতে ৪/৫ জন কিংস কমিশন প্রাপ্ত বাঙালী অফিসার, ৫০/৬০ জন জেওসি এবং শ'দুয়েক সিপাহী নিয়ে এ

www.icsbook.info

দেশটা স্বাধীন হয়েছিল। আজ যেখানে পৃথিবীর মর্যাদাসম্পন্ন বাঙালী আর্টিলারি, বিমান বাহিনী এবং নৌ বাহিনী বিদ্যমান। এ উন্নতি কোন মন্ত্র বলে ঘটেনি।

'৪৭-এর দেশ বিভাগের সময় দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার মত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাস করা কোন বাঙালী আইসিএস অফিসার ছিল না। মাত্র দু'জন মুসলমান নমিনেটেড আইএসসি ছিলেন, তাঁদের একজন পূর্ববঙ্গের ছিলেন— অপরজন পশ্চিমবঙ্গে থেকে যান। আজ দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলাতেই বাঙালী মুসলমান ছেলেরা প্রশাসন চালাচ্ছে। আজ রাষ্ট্র পরিচালনা, সেনা পরিচালনা, বিমানবহর, নৌযান, রেলওয়ে থেকে সব কিছু পরিচালনা করছে দেশের বাংলাভাষী মুসলমান ছেলেরা। যা পঞ্চাশ বছর আগেও কল্পনাতীত ছিল। কেমন করে ভুলে গেলাম, এসব কিছুই ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার অবদান। এসবই ১৯০ বছরের সংগ্রামের ফসল। কেমন করে ভুলে গেলাম, যে দেশে উচ্চ শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না, সে দেশে গড়ে উঠলো ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়, যে দেশে কোনদিন শিল্প-কারখানা ছিল না, সেখানে এক এক করে গড়ে উঠলো ৭৮টি পাট কল, ৬৩টি কাপড়ের কল, ৩টি কাগজের কল, ১৬টি চিনি কল। গড়ে উঠলো ১টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ২টি কৃষি কলেজ। ১টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৮টি মেডিক্যাল কলেজ এবং স্বতন্ত্র দেশের উপযোগী নানান প্রতিষ্ঠান। এসব কিছুই স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অঙ্গীকারে অর্জিত ফসল।

মড়ক লাগলে গ্রামকে গ্রাম যেমন বিরান হয়ে যায়, ভূমিকম্প কিংবা অগ্ন্যুৎপাতে দেশ যেমন শ্মশান হয়ে যায়, তেমনি হঠাৎ করে কোন বৈরী হাওয়া এসে আমাদের সাজানো দেশটাকে তছনছ করে ফেলেছে। আমরা যেন এক এক করে স্বেচ্ছামৃত্যুবরণ করে চলেছি। সকল মিল-কারখানা বন্ধ। কলেজ-ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়াশুনার পরিবেশ নেই। প্রশাসন বিপর্যস্ত, বিশৃংখল। কৃষি উৎপাদন বিপন্ন, ভোগ্যপণ্যের জন্য ক্রমাগত পরনির্ভরশীলতা বেড়েই চলেছে। সব কিছু যেন থেমে গেছে, দেশের দিকে কারও নজর নেই। এক সময় দেশ নিয়ে ভাবা হত। ভাবা হত দেশ ও জাতির অগ্রগতি নিয়ে। ভাবা হত দেশের মানুষের কথা, দেশের মানুষের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিল্প-কারখানা গড়ার কথা। খাদ্য উৎপাদন, বেকারত্ব হ্রাস, আমদানী-রফতানীসহ জাতীয় আয় বৃদ্ধির কথা। আরও ভাবা হত জাতীয় ঐতিহ্যমন্ডিত শিল্প-সংস্কৃতির কথা। আজ দেশ নিয়ে কেউ ভাবছে না। সবাই নিজ নিজ আখের গুছানোর কথা চিন্তা করছে। দেশ না বাঁচলে যে নিজে বাঁচা যায় না— সে কথা কেউই চিন্তা করছে না।

আমরা যদি উদার হৃদয়ে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি, তাহলে স্পষ্ট দেখতে পাব শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করে অতিদ্রুত আমরা সার্বিক উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিলাম। আজ আবার শূন্যে ফিরে যাচ্ছি। কেন এই স্বেচ্ছামৃত্যু? কার প্ররোচনায় এই আত্মহত্যা?

১৮.১০.৯৬

www.icsbook.info

সাংস্কৃতিক পরাধীনতাই জাতির প্রকৃত পরাধীনতা

স্বাধীনতা হরণ করতে হলে বিরাট সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে দেশ দখল করার প্রচলিত ব্যবস্থাটা আজ পুরনো হয়ে গেছে। দেখা গেছে, শুধুমাত্র সৈন্যশক্তির বলে দেশ দখল করে বেশী দিন রাখা যায় না, আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আধিপত্যকে পাকাপোক্ত করতে হলে তাই প্রয়োজন পড়ে একশ্রেণীর হীনমন্যতাবোধ সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টির, যারা জাতিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করে। যারা সততই উচ্চারণ করবে তোমরা ওদের মত হও। যদি মানুষ হতে চাও, তবে নিজের মত নয়, ওদের আদলে নিজেকে গড়ে তোলো। কথা বল ওদের ভাষায়, নকল কর ওদের, অস্বীকার কর নিজের সত্তা এবং নিজের সৃজনশীলতাকে। তুমি রূপান্তরিত হও ঐ ওদের জাতিসত্তায়। আর তখনই আসে সাংস্কৃতিক পরাধীনতা।

স্বাধীনতা মানে জাতীয় মূল্যবোধের ভিত্তি স্থাপন। আমাদের স্বাধীনতার আটাশটা বছর পার হয়ে গেল, অথচ এই দীর্ঘ সময়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন ফল লাভই হচ্ছে না বলে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন। একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলে আমাদের বুঝতে কষ্ট হবে না যে, সাংস্কৃতিক পরাধীনতাই এর কারণ। স্বাধীনতার পর সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার যে প্রয়োজন পড়ে, নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারার অনুগামী হতে হয়, সেই ধারাটি প্রতিষ্ঠা করতে আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি। যার ফলে স্বাধীনতার মুখোশ পরে দাসত্বের আয়োজন করেছি মাত্র। স্বাধীনতার পর পরই আমাদের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী নানান লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে জাতির সংস্কারবদ্ধতা, শিকড়হীন অস্তিত্ব, সাংস্কৃতিক কসমোপলিটানইজম, শিল্পের অনুকরণবাদ, মেটাফিজিক্যাল অবসন্নতা তথা স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রবণতা এমনভাবে দেশের এবং জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন যে, আমাদের জাতীয় দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, আমাদের জনগণের সংস্কৃতি সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। আধিপত্যবাদীদের ঐসব ক্রীড়নক বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীনতার জন্মকাল থেকে আমাদের জনগণের কানে একটি সবকই দিয়ে চলেছেন সেটা হল তোমাদের ভাষা এক তোমাদের সংস্কৃতিও এক। তোমরা বাঙালী অতএব তোমাদের সংস্কৃতির চেহারাও ওদের মত হতে হবে। ২৮ বছরেও আমরা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছি যে, ভাষার কারণে সংস্কৃতি এক বা ভিন্নরূপ ধারণ করে না, সাংস্কৃতিক দর্শনের ভিন্নতার কারণেই সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে থাকে। ওদের সাথে আমাদের ভাষার মিল থাকতে পারে, কিন্তু সাংস্কৃতিক দর্শনে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী।

www.icsbook.info

এদেশের শতকরা ৮৮ ভাগ জনগোষ্ঠী মুসলমান। তারা নিরাকার এক আল্লাহর উপাসক। তাদের কাছে সৃষ্টিকর্তা রূপে নয়, অরূপে আরাধ্য। অপরপক্ষে বাংলাভাষী আর এক গোষ্ঠী সাকার বহু দেবতার উপাসক। তাদের দেবায়তন, দেবমূর্তি, পূজারতি, নৈবেদ্য, মুসলমানদের মসজিদ কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক দর্শন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এদেশের মুসলমানদের ২১৪ বছর ধরে স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ের অনুপ্রেরণাই ছিল সেই স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক জীবন-চেতনা। অপরজাতি হিন্দুদের বহু ঈশ্বরবাদ, সামাজিক বৈষম্য, একদেশদর্শী কল্যাণের দর্শনের সাথে মুসলমানদের একেশ্বরবাদ, সাম্য, সামাজিক সুবিচার, ন্যায় ও কল্যাণবোধের সংস্কৃতির কোন মিল ছিল না বলেই মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমি গঠন করতে হয়েছিল। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ এবং সংস্কৃতি যদি আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তি হত, কিংবা দ্বি-জাতিতত্ত্ব যদি ভুল প্রমাণিত হত, তাহলে পশ্চিমবঙ্গতো হিন্দু ভারতের সাথে থাকার কথা নয়। কিন্তু কই সেখানে তারাতো ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে দুই বাংলা স্বাধীন হওয়ার কথা ভাবছে না। বরং তাদের অর্থনীতি, বাঙালীত্ব সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলেও শুধু হিন্দুত্ববাদকে আঁকড়ে ধরে তারা হিন্দি ভারতের অঙ্গ রাজ্য হয়ে থাকতে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করছে। সুতরাং আমাদের এই কথাটা পরিষ্কার ভাবে মনে রাখতে হবে যে,বাংলাদেশের মানুষের ইসলামী চেতনাই বাংলাদেশকে ভারতের গ্রাস থেকে আলাদা করে রেখেছে। এদেশের মানুষের ইসলামী চেতনা যত দুর্বল হয়ে পড়বে, তাদের স্বাধীন অস্তিত্বও তত হুমকির সম্মুখীন হবে। এই স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মুছে দেবার প্রয়াসেই এদেশের সংস্কৃতিতে এত ঘোলা পানির প্লাবন, এত ডাইনীর আবির্ভাব। আমাদের গান, নাটক, চলচ্চিত্র, পেন্টিংস, ভাস্কর্য তথা সাংস্কৃতিক প্রকাশভঙ্গীর সকল ক্ষেত্র আজ ডাইনীদের কবলে।

হিন্দু ও মুসলমানদের কালচার যে কোন কালেই এক ছিল না একথা বহুজন বহুভাবে বলে গেলেও ডাইনীরা বুঝতে চান না। এক হাজার বছর আগে আলবেরুনী এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম কালচারের প্রভেদের কথা বলে গেছেন।

১৯৩৫ সালে জওহরলাল নেহেরু যে আত্মজীবনী প্রকাশ করেন, তাতে তিনি লিখেছেন যে, মুসলমান এবং হিন্দু দুই ধরনের পাত্র ব্যবহার করে। তার ৪০ দশকে লেখা 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' বইতে ভারতীয় কালচার বলতে প্রাক-ইসলামী যুগের কালচারকেই বুঝিয়েছেন। সুতরাং বাঙালী মুসলমান এবং বাঙালী হিন্দুর ভাষা এক হলেও কালচার যে এক নয়— এটা নতুন করে প্রমাণ করার অবকাশ নেই। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুর মাত্র দু'বছর আগে ১৯৩৯ সালে লিখিত 'ভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন- "বাংলাদেশের ইতিহাস খন্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ ও

www.icsbook.info

পশ্চিমবঙ্গ, রাঢ় বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয়— অন্তরেরও ভাগ, সমাজেরও মিল নাই। এতকাল যে আমাদের বাঙালী বলা হয়েছে, তার সংজ্ঞা হচ্ছে, আমরা বাংলা বলে থাকি।" আজ যারা সেই বাঙালীর ধ্বজা উড়িয়ে পূর্ববঙ্গ এক করে ফেলতে চান, তারা যে এদেশের মানুষের স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্যকে বিনাশ করার লক্ষ্যে আধিপত্যবাদীদের পক্ষ শক্তি হয়ে কাজ করছেন, সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে কি? যারা বাঙালী জাতীয়তাবাদের কথা বলছেন, তারা যে পরোক্ষভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কথাই বলে থাকেন, একথাটি বুঝতে যত বিলম্ব হবে, আমাদের দুর্দশার দিনগুলো ততই প্রলম্বিত হবে। যে সংস্কৃতির উৎস 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' সেই সংস্কৃতির সাথে ব্রাহ্মণ্যবাদী শ্রেণী বিভাজন, পূজা-পার্বণ, উলঙ্গ নৃত্য কলা, দেবদাসী এবং বলিদান সংস্কৃতির যে মিল থাকতেই পারে না একথাটা আমাদের ক্রমশ ভুলিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমরা ক্রমাগত পৌত্তলিক সংস্কৃতির দাসে রূপান্তরিত হচ্ছি।

মুসলমানরা এদেশে এসে শুধু রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করেনি, এদেশের সমলিত, পতিত, সংস্কৃতিকে দূরে ঠেলে দিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াতে সক্ষম হয়েছিল বলেই ৮০০ বছর ধরে তারা এদেশে শাসন ক্ষমতা পরিচালনায় সক্ষম হয়েছিল।

মুসলমানরা আসার আগে এদেশের হিন্দু সমাজে নৈতিকতা বলতে কিছুই ছিল না। পবনদূত ও কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর রাম চরিত্র থেকে জানা যায় যে, সেন রাজারা মন্দিরের সেবায় "দেবদাসী ও যুবতী ব্রাহ্মণ বিধবাদের নিয়োগ করার প্রথা প্রবর্তন করেন। এতে উচ্চ শ্রেণীর ও প্রভাবশালী হিন্দুদের উপভোগের জন্য একটি উপাদানের সংস্থান হয়। ফলে হিন্দু সমাজের নৈতিকতায় পতন ঘটে এবং দুর্নীতি ও অনাচার সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে।" (ডঃ এম. এ রহীমঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস)

কাল বিবেক এবং কালিকা পুরাণে বলা হয়েছে দুর্গাপূজা, হোলি ইত্যাদি উপলক্ষে মেয়ে-পুরুষ উভয়ের মধ্যে যৌনাচার কদর্যতা চলতো।

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের লেখা থেকে জানা যায় যে, আর্য সমাজে একজন নারীর একই সাথে চার-পাঁচজন পুরুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলাই ছিল সামাজিক রীতি। বরং তা করতে অনিচ্ছুক যুবতীকে সামাজিক শাস্তি ভোগ করতে হত। ডঃ অতুল সুর ভারতের বিবাহের ইতিহাস নামক বইতে লিখেছেন, 'হিন্দু সমাজে বহুপত্নী গ্রহণের সাথে সাথে বহুপতি গ্রহণ প্রথাও চালু ছিল। (মহাভারতের দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর কথা এখানে উল্লেখ্য)

www.icsbook.info

ইবনে খালদুনের লেখা থেকে আরও জানা যায় যে, যদি কোন স্ত্রীর তার স্বামীর ঔরসে সন্তান না জন্মাতো, তাহলে অন্য পুরুষের সঙ্গ নিয়ে সন্তান ধারণ করাটা দোষের ছিল না। বরং তা ধর্মীয় বিধানরূপে গণ্য হত। হিন্দুদের ইতিহাসে এবং সাহিত্যে এ ধরনের উপমা প্রচুর পাওয়া যাবে। যেমন মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিত্র পাণ্ডুর দুই স্ত্রী ছিল কুন্তী দেবী ও মাদ্রী। পাণ্ডু সন্তান জন্মদানে অক্ষম ছিলেন বিধায় আপন স্ত্রী কুন্তী দেবীকে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের সাথে সঙ্গদানের অনুমতি দিয়ে লাভ করেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন নামক তিন পুত্র এবং অপর স্ত্রী মাদ্রীর সাথে অশ্বিনী কুমারদ্বয়ের সঙ্গমে জন্ম নেয় নকুল ও সহদেব। এরাই মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডব নামে খ্যাত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ব্যভিচারকে ধর্মীয় স্বীকৃতি এবং অনুমোদন দান করা হয়েছিল।

যে জাতির পোশাক ছিল না, উন্নত রন্ধন প্রণালী জানা ছিল না। যারা কালীপূজায় নরবলি দিত, সতীদাহের নামে জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারতো, সেই জাতি বা সম্প্রদায়ের কাছে উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী বাংলার ১২ কোটি মুসলমান আজ সংস্কৃতির পাঠ গ্রহণ করতে চাইছে।

যে মুসলমানরা একদিন এদেশের জনগণকে কুসংস্কারমুক্ত করেছিল, উন্নত প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করেছিল, সকল বেদাতের মূলচ্ছেদ করেছিল, ইতিহাস লেখার কৌশল শিখিয়েছিল, স্থাপত্যে, চিত্রশিল্পে নতুন যুগের সূচনা করেছিল, এদেশের আঞ্চলিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিল, সাহিত্যে মানবীয় উপাদান সংযুক্ত করেছিল, এদেশের মানুষের পোশাকে মার্জিত রুচির প্রসার ঘটিয়েছিল, জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের নানান উপকরণ, যেমন কার্পেট, সতরঞ্জি, পর্দা, হাউজ, ফোয়ারা, হাত ধোয়ার বেসিন (চিলিমচি) টেবল ক্লথ, ডিস, জগ প্রভৃতি অসংখ্য জিনিসের উদ্ভব ঘটিয়েছিল, এদেশের মানুষকে আদব-কায়দা শিখিয়েছিল, সঙ্গীত শাস্ত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল— আজ তারাই পতিতের কাছে সংস্কৃতির ভিক্ষা গ্রহণের জন্য হাত পেতেছে, এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আর কি হতে পারে। আজ আবার 'শেখ', 'সৈয়দ', 'কামাল' গালিবদের বংশধররা কুৎসিত বিকৃত নাম ধারণ করে কালু, গেদু, পাচু, ভুলু, চুনু, হাবু প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর পরমানিকের 'হাজামের' নামের স্তরে নেমে যেতে চাইছে।

আজ আবার দেশকে 'দুর্গা মা', 'কালী মায়ের' স্তরে নামিয়ে বন্দনা করা হচ্ছে। মুসলমান ছেলেরা গলা ফাটিয়ে গাইছে। 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী মা' কিংবা 'ডান হাতে তোর খড়গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শংকা হরণ', "দুই নয়নে স্নেহের হাসি ললাট নেত্র আগুন বরণ। ওগো মা, তোমার কি মূর্তি আজি হেরিরে" প্রভৃতি মাদার কাল্টের রবীন্দ্র সংগীত।

www.icsbook.info

হযরত ইবরাহীম (আঃ) কে নমরুদ কর্তৃক অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপের কাহিনীর সাথে জড়িত, অসতী মেয়েদের সমাজ থেকে আলাদা করার চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত সিঁদুর, টিপ আজ মুসলমান মেয়েদের সৌন্দর্য চর্চায় রূপ নিয়েছে। মূর্তি নির্মাণ ইসলামে হারাম হলেও এদেশে মূর্তি নির্মাণ ও মূর্তি বন্দনা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে। মসজিদ নগরী নামে গর্বিত ঢাকা খুব শীঘ্রই মূর্তি নগরীতে রূপান্তরিত হতে চলেছে। এছাড়া উলুধ্বনি, মঙ্গল প্রদীপ, মঙ্গলঘট, রাখীবন্ধন, দোলযাত্রা, বৈশাখী মেলার নামে তরুণী পরিবেশিত 'পান্তা কালচার', আমাদের সত্য সুন্দরের সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। এর কুফলও ফলতে শুরু করেছে সমাজের সর্বস্তরে।

যে মুসলমানরা এদেশের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনকে উন্নত করেছিল, এদেশে আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ সৃষ্টি করেছিল, এদেশের সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল, আজ তারা জ্ঞান সাধনা, তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা কার্যে পিছিয়ে পড়ে দুর্বল নির্বীর্য হয়ে পড়েছে। তারা হীনমন্য, মানসিক ভাবে গোলাম হয়ে পড়ায় তাদের উপর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় হামলাই একসাথে পরিচালিত হচ্ছে। এর একটাই উদ্দেশ্য রাজনৈতিকভাবে পরাভূত হলে, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এই জাতি হাজার বছরেও যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। আজ ইসলামী সংস্কৃতির গাড়ী খোদাদ্রোহী ড্রাইভারদের হাতে পরিচালিত হয়ে জাহান্নামের পথে এগিয়ে চলেছে। এই গাড়ীর গতিধারা বদলাতে হলে এর ইঞ্জিন ছিনিয়ে নিতে হবে। রাজনৈতিক পরাজয় এড়াতে হলে আমাদের সাংস্কৃতিক পরাজয়কে অবশ্যই রুখে দাঁড়াতে হবে। কারণ, সাংস্কৃতিক পরাধীনতাই আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার সমস্ত পাঁচিল ভেঙে দিয়ে রাজনৈতিক পরাধীনতা ত্বরান্বিত করবে।

১৪.০৪.৯৯

www.icsbook.info

বাঙালী জাতিসত্তার বিকাশে মুসলমানদের অবদান

মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্যই একটা জাতিকে নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্বের আসনে বসতে সাহায্য করে। এক সময় মুসলমানরা বিশ্বনেতৃত্বের কর্তৃত্ব লাভ করেছিল সত্যানুসন্ধিৎসা এবং জ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে সভ্যতার আলো বিকশিত হয়েছিল ইসলামের আবির্ভাবের ফলেই।

এই পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশের সভ্যতা বিকাশেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উপমহাদেশের সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও আমরা দেখতে পাব, মুসলমানদের আগমনের ফলেই এদেশে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

আজ কেউ স্বীকার করুন বা নাই করুন, উপমহাদেশের সভ্যতা বিকাশে মুসলমানদের অবদান যে বে-শুমার, সেই বিষয়ে ইতিহাসে কোন ভ্রান্তি নেই।

মুসলমান আগমনের পূর্বে এদেশের মানুষ মুদ্রার ব্যবহার জানত না, কড়ি দিয়ে কেনা-বেচা চলত বলে 'তবকত-ই-নাসিরী'তে উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে, রাজা লক্ষ্মণ সেন অনুগ্রহভাজনদের লক্ষ কড়ি দান করতেন। মুসলমানরা স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন করায় দেশে বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে দেশ ধাপে ধাপে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। ইতিহাস বলছে, পলাশী যুদ্ধের আগের পাঁচশ' বছরই বাংলাদেশ প্রকৃত 'সোনার বাংলা' ছিল— তার আগেও নয়, পরেও নয়।

আজ আর্য সভ্যতার যত বড়াই করা হোক না কেন, এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, মুসলমান আগমনের পূর্বে এদেশের মানুষ সেলাই করা পোশাকের ব্যবহার পর্যন্ত জানত না। নারী-পুরুষ দু'খণ্ড বস্ত্র দিয়ে লজ্জা নিবারণ করত। গবেষক সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন, 'হিন্দু সাধুর পরনে সেলাই করা পোশাকের আগমন মুসলিম যুগে বলে মনে হয়। কারণ হিন্দুশাস্ত্রে সেলাই করা পোশাক নিষিদ্ধ ছিল। লক্ষ্য করবেন, 'দর্জি শব্দের কোন বিকল্প শব্দ ভারতীয় প্রাচীন ভাষায় নেই। সীবনকার অর্বাচীন কৃত্রিম শব্দ' (বাংলার বাউল ঃ সুধীর চক্রবর্তী)। আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'তে উল্লেখ করেছেন, বাংলার নারী-পুরুষের দেহের বেশীর ভাগই নগ্ন থাকত, কেবল কোমরের কাছে লেঙুটির মত একটুখানি কাপড় থাকত। সুন্দর সুন্দর পোশাকের ব্যবহার মুসলমান আমল থেকেই চালু হয়।

মুসলমান আগমনের পূর্বে এদেশের মানুষ সুস্বাদু আহার প্রস্তুত প্রণালী জানত না। পর্যটক 'র‍্যালফ ফিচ' বর্ণনা করেছেন, 'তারা মাছ খায় না, পশু হত্যা করে না, ভাত-দুধ

www.icsbook.info

ও ফলমূল আহার করে জীবন ধারণ করে।' সুতরাং আজকের কোর্মা, পোলাও, বিরিয়ানী, কোপ্তা-কালিয়া, কাবাব, পরটা, আচার যাদের রসনা তৃপ্ত করে, তারা সকলেই মুসলমানদের কাছে ঋণী।

মুসলমান রাজত্বের পূর্বে এদেশে ইতিহাসবিদ বলে কেউ ছিল না। মুসলমানরাই প্রথম ইতিহাস রচনায় হাত দেয়। আফগান ইতিহাসবেত্তা আবদুল্লাহর তারিখ-ই-দাউদী, আহমদ ইয়াজগার-এর 'তারিখ-ই-শাহী', মীর্জা নাথন-এর 'বাহারিস্তান-ই-গায়েবী'সহ অসংখ্য ইতিহাস গ্রন্থই তার প্রমাণ।

মুসলমান আগমনের পূর্বে এদেশের মানুষের মধ্যে সামাজিক নৈতিকতা বলতেও কিছু ছিল না। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার তাঁর 'দি হিস্টরী অব বেঙ্গল' বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন, 'এদেশে মুসলিম আসার আগে কালচার বলে কিছু ছিল না। তারা সাপ, ব্যাঙ, গাছ, পাথর ইত্যাদি পূজা করত। তাদের মধ্যে ভাল বামুনও ছিল না।' গবেষক, ঐতিহাসিক ডঃ এম.এ রহীম তাঁর 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস' শীর্ষক গ্রন্থের ১ম খণ্ডে লিখেছেন, 'দুর্গা পূজা, হোলি, ইত্যাদি উপলক্ষে মেয়ে-পুরুষ উভয়ের মধ্যে যৌনাচার ও কদর্যতা চলত। গীত গোবিন্দ ধরনের কবিতা ও গ্রন্থ যার বিষয়বস্তু যৌন আবেদন জাগিয়ে তোলে, দরবারে, জনসমাবেশে আবৃত্তি করা হত এবং লোকেরা এসব খুব উপভোগ করত। মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের পরে মুসলমানদের সামাজিক প্রভাবের ফলে হিন্দু সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধিত হয়।'

আজকের বাংলা সনের প্রবর্তক মুসলমানরাই। 'সন' শব্দটি আরবী, সাল শব্দটি ফারসী। সম্রাট আকবরের নির্দেশে ৯৬৩ হিজরী সালে সৌর বছরের ৩৬৫ দিনের হিসাবে ফসলী সন হিসাবে বাংলা সন চালু করা হয়। বাংলা সনের উদ্ভাবক ছিলেন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী আমীর ফতে উল্লাহ সিরাজী।

ছয়টি জনপদ নিয়ে 'বাংলা' নামের দেশ ও জাতীয়তার পরিচিতি গঠনও মুসলমানদের কৃতিত্ব। মুসলমান আগমনের আগে বাংলা নামটির সাথেও এদেশের মানুষের পরিচয় ছিল না। মুসলমানরাই প্রথম এদেশের খণ্ড খণ্ড অঞ্চল, একটা রাজনৈতিক ঐক্যে সংহত করে এর নামকরণ করেন 'বাংলা'। সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহই সেই ব্যক্তি, যিনি খণ্ড খণ্ড অঞ্চলের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও ভাষাগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে 'বাংলা' নামের একটি দেশ, 'বাঙ্গালী' নামের একটি সংঘবদ্ধ জাতি সৃষ্টি করেন, এবং নিজে 'শাহ্-ই-বাঙ্গালী' উপাধি ধারণ করে গর্বিত হন। ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য অনুযায়ী 'বাঙ্গালী জাতির জনক' যদি কেউ থেকে থাকেন, তবে সেই ব্যক্তির নাম সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ হওয়া উচিত। কারণ তাঁর আমল থেকেই 'বাংলা' এবং

www.icsbook.info

বাঙালীর ইতিহাসের সূচনা হয়। আর্য আমলে যে বাংলা অঞ্চল ছিল পতিত, ঘৃণিত, হিন্দু এবং বৌদ্ধ রাজারা যেখানে নিজেদের গৌড়েশ্বর বা গৌড়াধিপতি নামে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন, সেখানে মুসলমান সুলতান শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ নিজে 'শাহ-ই-বাঙ্গালী' উপাধি ধারণ করে বাংলাদেশ এবং বাঙ্গালী জাতিকে প্রথমবারের মত রাজনৈতিক আভিজাত্যের গৌরব দান করেন। সেই পরিচিতি এবং মালিকানাস্বত্ব নিয়েই আজ আমরা বাংলাদেশ নামক স্বাধীন দেশের নাগরিক। মুসলমানরাই উত্তর ভারতে সৃষ্টি করে উর্দু ভাষা এবং বালাদেশে সৃষ্টি করে বাংলা ভাষা। মুসলমানরাই বাংলা ভাষার উৎকর্ষ ঘটান। মুসলমানরাই বাংলা ভাষা সাহিত্যের আদি জনক। মুসলমান আগমনের পূর্বে, এদেশের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা চর্চার বিরুদ্ধে কঠোর ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল। বাঙ্গালীর মুখের ভাষাকে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকরা অপবিত্র, ইতর এবং পক্ষীর ভাষা অভিহিত করে বলত, বাংলা ভাষায় যারা বেদ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পাঠ করবে, তাদের ঠাঁই হবে ভয়াবহ 'রৌরব' নরকে। শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন লিখেছেন, 'আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।' মুসলমান আগমনের আগে বাংলা ভাষায় এমন কিছুই আবিষ্কৃত হয়নি- যাকে সাহিত্য পদবাচ্য বলা যেতে পারে। ডঃ এম.এ রহীম তাঁর 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, 'যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হত এবং এ দেশে আর কয়েক শতকের জন্য হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকত, তাহলে বাংলাভাষা বিলুপ্ত হয়ে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হত।' মুসলমান শাসকরাই ঘৃণিত ও অবহেলিত বাংলা ভাষাকে রাজ-দরবারে আমন্ত্রণ জানান এবং বাঙ্গালী কবি ও বিদ্বান ব্যক্তিদের প্রতি উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। এর বহু নজীর উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিভাশালী মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'ইউসুফ জুলেখা' রচনা করেন, যা বাংলা সাহিত্যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল।

গৌড়াধিপতি সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৭)-এর রাজত্বকালকে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নবযুগের প্রবর্তন করেন। তাঁর আমলেই বাঙ্গালীদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাহিত্যিক প্রতিভার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁরই উদার পৃষ্ঠপোষকতায় যশোরাজ খান রচনা করেন 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস রচনা করেন 'মনসামঙ্গল' এবং 'মনসা বিজয়' কাব্য। হোসেন শাহ-এর সেনাপতি পরাগল খাঁ-এর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত-এর আদিপর্ব বাংলায় অনুবাদ করেন। যে আমলে ব্রাহ্মণ ছাড়া, জনসাধারণের মহাভারত শ্রবণ করাও

www.icsbook.info

নিষিদ্ধ ছিল, সেই আমলে 'মহাভারতের' বাংলা অনুবাদ করাটা বিপ্লবাত্মক ব্যাপার। মুসলমান কবিরাই ছিলেন বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস বিষয়ক সাহিত্য রচনার পথিকৃৎ। সুলতান ইউসুফ শাহের সভাকবি শেখ জয়নুদ্দীনই প্রথম রসূলে খোদার অসাধারণ জীবন-বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচনা করেন বিখ্যাত 'রসূল বিজয়' কাব্য। সুলতান বারবক শাহ-এর বিখ্যাত সেনাপতি দরবেশ ইসমাইল গাজীর জীবনী অবলম্বনে শেখ ফয়জুল্লাহ লেখেন 'গাজী বিজয়' কাব্য। এক কথায় মুসলমান কবিগণই বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তোলেন। মুসলমান কবিরাই বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী সাহিত্যের মূল্যবান ঐশ্বর্য এনে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেন। মুসলমান কবিরাই বাংলা সাহিত্যে হিন্দু সাহিত্যের সম্পদও আনয়ন করেন। আলাওলের পদ্মাবতী কাব্য মুসলমান কবিদের উপর সেই প্রভাবের দৃষ্টান্ত বহন করে। যদি ধরে নেই, ভাষাই জাতির শিকড়, যা ভিতর থেকে জাতিকে সুদৃঢ় করে, ভাষাই জাতিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখায়, শিরদাঁড়া সোজা রাখে, ভাষাই মানুষের মুখশ্রী, তাঁর মানসিক অবস্থার স্থায়ী-অস্থায়ী প্রতিধ্বনি। সেই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভীতি সঞ্চার করে একদিন স্তব্ধ করে রাখা হয়েছিল, রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। মুসলমানরাই বাংলা ভাষার সেই অবরুদ্ধ দ্বার খুলে দেয়। কোন কোন পণ্ডিত উইলিয়াম কেরীকে বাংলা সাহিত্যের গদ্যের জনক আখ্যা দিয়ে থাকেন। উইলিয়াম কেরীকে এই সম্মান দেয়া হয় বাংলাকে সংস্কৃতকরণে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের জন্য। কেরী বাংলাকে যা করেছিলেন, বৃটিশ আমলে বাংলার রক্ষণশীল পণ্ডিতরাও তাই করতে চেয়েছিলেন। তারা বাংলাভাষাকে সংস্কৃতকরণ করে জনসাধারণ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

পলাশী যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর মুসলমানদের অবস্থা কেমন ছিল সেই প্রসঙ্গে W.W HUNTER ১৮৭২ খৃঃ লিখেছিলেন, "A hundred and seventy years ago it was almost impossible for a well born Musalman in Bengal to become poor, at present it is almost impossible for him to continue rich" অর্থাৎ ১৭০ বছর আগে কোন মুসলমানের গরীব হওয়া অসম্ভব ছিল। বর্তমানে তাদের পক্ষে ধনী হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানদের সেই দুর্দিনের সুযোগে মুসলমান আমলের বাংলাকে অপাঠ্য কদর্য আখ্যা দিয়ে বর্জন করা হয়। শ্রীরামপুরের খৃস্টান পাদরী উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার, রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামরাম বসু প্রমুখ সংস্কৃতে পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের কন্যা হিসেবে গড়ে তুললেন, তাদের সৃষ্ট নতুন বাংলা ভাষাকে আর্য ভাষা বলতে আর কোন বাধা থাকল না। পণ্ডিতগণ এই নতুন

www.icsbook.info

ভাষার নাম দিলেন 'সাধুভাষা'। বাঙ্গালী মুসলমানরা দীর্ঘদিন এই পণ্ডিতি সাধুভাষা চর্চা করেনি। বাংলা ভাষার বন্ধ্যাত্ব দশা ঘুচিয়ে সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে যারা বাংলাকে পুষ্ট ফলপ্রসূ করে তুলেছিল। শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরাজয়ের সুযোগ নিয়ে হিন্দু পণ্ডিতগণ সেই মুসলমানী বাংলাকে 'ম্লেচ্ছাক্ষর', 'যাবনিক শব্দ' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিলেন। শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে মুসলমান বাংলা ভাষায় লিখিত পুঁথি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান পেল না— তার স্থান হল বটতলায়। এভাবেই মুসলমানরা দীর্ঘদিনের লালিত বাংলা ভাষার অধিকার হারাল, 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হল, বিদেশীর ফরমানে এবং তার সূত্রধার হলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সাথে যাদের ভাসুর ভাদ্রবৌ-এর সম্বন্ধ'। আজ বাংলাদেশের মুসলমানরা সৌভাগ্যক্রমে একটা স্বাধীন দেশের নাগরিক, কিন্তু কেন জানি স্বাধীন চিত্তের অধিকারী হতে পারছে না। আজকের প্রজন্মের অনেকেই তাদের পূর্ব-পুরুষদের অবদানের কথা জানে না।

কোন পশ্চাৎপদ জাতির নবজাগরণের সূচনা হয় তার ঐতিহ্য চেতনা থেকে। ঐতিহ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে মনোদাসত্ব ভর করে। মানসিক গোলামী নিয়ে স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা যায় না, জাতি হিসেবেও বেঁচে থাকা যায় না। তাই সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর ভাষায় বলতে হয়, 'দেখ একবার ইতিহাস খুলি/কত উচ্চে তোরা অধিষ্ঠিত ছিলি/তথা হতে হায় কেনরে পড়িলি/নয়ন মেলিয়া দেখ একবার।' চোখ মেলে দেখতে হবে আমরা কোথায় ছিলাম, আজ কোথায় আছি, এই পদস্খলনের কারণই বা কি।

১৪.০৪.৯৮

www.icsbook.info

ইসলাম ও সংগীত

সংগীত বৈধ না অবৈধ। ইসলাম সংগীতকলা অনুমোদন করে কি করে না, সে বিষয়ে মত বিরোধের অন্ত নেই। কোন কোন আলেম সংগীতকে 'দ্বিনা মালাহী' আখ্যা দিয়ে ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী। কেউ আবার বাদ্যযন্ত্রবিহীন সংগীত পরিবেশনাকে অনুমোদন করা যেতে পারে বলে মত দিয়ে থাকেন। কেউ বলেন, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, কোন জিনিসের ভাল-মন্দ নির্ভর করে নিয়তের উপর, সুতরাং গানবাদ্য বিরোধী যুক্তিগুলো অত্যন্ত দুর্বল।

আজকের পৃথিবীতে ভোগবাদী চিন্তা যখন প্রকট, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ভোগবাদী দুনিয়া যখন সংগীতের ঝংকারকে প্রকটভাবে মানবতাবিরোধী কাজে ব্যবহার করে সমাজে পাশবিক উচ্ছৃংখলতা বিস্তার করে চলেছে, তখন আমরা কান বা চোখ বন্ধ করে সেই উন্মত্ত সংগীতের কু-প্রভাব থেকে গা বাঁচিয়ে চলতে পারব কি না, সেই কথাটাই আজ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে। আজকের প্রেক্ষাপটে সংগীতের মত একটা সুকুমার শিল্পকে জীবন থেকে বাদ দেয়া বা হারাম ঘোষণা করার পূর্বে ভাবতে হবে। বিশেষ করে এ ব্যাপারে যখন কোন অকাট্য দলীল বা সুস্পষ্ট ঘোষণা নেই, তখন সংগীতের মানব কল্যাণকামী দিকগুলো বিবেচনা এবং সুস্থ সমাজ নির্মাণে তার উপযোগিতা বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু মনোভাব নিয়ে গবেষণা করে সংগীতকে আমরা গ্রহণ করব কি না, করলেও কিভাবে গ্রহণ করব, সে ব্যাপারে গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রথমেই দেখা যাক সংগীত কি? সংগীতের উৎপত্তি কিছু ধ্বনির সমষ্টি থেকে। আর ধ্বনির সৃষ্টি দুটি জিনিসের সংঘর্ষের ফলে। পৃথিবী আপন কক্ষপথে ঘোরার ফলে বাতাসের সাথে তার নিয়ত যে সংঘর্ষ হচ্ছে, তার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে এক প্রকার ধ্বনি-তরঙ্গ। সেই ধ্বনি-তরঙ্গই সৃষ্টি করে চলেছে একরকম সুর। বাতাসে কান পাতলেই সে সুর শোনা যাবে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তো পৃথিবীটাই সুরময়। এখানে বাতাসে সুর, গাছের পাতার আন্দোলনে সুর, নদীর কলতানে সুর, বৃষ্টির শব্দে সুর, সাগরের জোয়ারে সুর। পৃথিবীর সর্বত্রই সুরের রাজ্য। আর ছন্দ বা তাল ছাড়া তো পৃথিবী অচল।

সমানতালে নির্ভর করে সূর্যোদয় সূর্যাস্ত হচ্ছে। তালে তালে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরত, হেমন্ত প্রভৃতি ষড়ঋতুর পরিক্রমা ঘটছে। তাল, লয়, ছন্দে বাঁধা আছে আমাদের নাড়ীর স্পন্দন, হার্টবিট, হাঁটা-চলা, কাজ করা সব কিছুই। তাল বা ছন্দ হারিয়ে গেলে পৃথিবীটাই অচল হয়ে পড়বে। সুতরাং সুর ও তালের সমন্বয়কে যদি সংগীত বলা হয়, তাহলে পৃথিবীটাই সংগীতময়। জীবনের উষালগ্ন থেকেই সংগীত আমাদের জীবনের সংগে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই সংগীত আমাদের সাথী। এমন কোন মানুষ নেই যিনি কোকিলের তানে মুগ্ধ হন না, আজানের সুরে

www.icsbook.info

বিমোহিত হন না। মনকে আনন্দ দান, হৃদয়ের প্রশান্তি ও সুখানুভূতির জন্য মানব জীবনে সংগীত অপরিহার্য। আর আনন্দ, স্ফূর্তি এবং উৎফুল্লচিত্ত হয়ে থাকা ইসলামে অন্যায় নয়। ইসলাম একটি বাস্তববাদী জীবন বিধান। নভোমন্ডলে বিচরণকারী মানুষকে ফেরেশতা মনে করে ইসলাম তার বিধান তৈরী করেনি। ইসলাম মানুষকে হাটে, মাঠে বিচরণকারী মানুষ হিসেবেই তার বিধান তৈরী করেছে। মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবগত ভাবধারার উপর লক্ষ্য রেখেই ইসলাম হালাল-হারামের বিধান দিয়েছে। সুতরাং মানব জীবনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তারকারী সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সাথী, তার আধ্যাত্মিক জীবনের অনুপ্রেরণা, জীবনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় সংগীতকে ইসলাম উপেক্ষা করবে কি করে?

পবিত্র কোরআনে সুমধুর সুরকে পরোক্ষভাবে প্রশংসা করে বলা হয়েছে- "নিশ্চয় গর্দভের স্বর বড়ই অপ্রীতিকর।" (৩১ঃ১৮)। আমাদের রাসূল (সা.) বলেছেন- 'তোমার কণ্ঠধ্বনি দ্বারা কোরআন শরীফের আবৃত্তিকে সুষ্ঠু ও সুমধুর করে তোল। সকল বস্তুর জন্যই অলঙ্কার রয়েছে- পাক কোরআনের অলঙ্কার সুমধুর সুর।'

বুখারী শরীফে উল্লেখ আছে- "হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আনসার বংশের এক ব্যক্তির সাথে একটি মেয়ের বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। তখন নবী করীম (সা.) বললেন- হে আয়েশা! ওদের সংগে আনন্দ-স্ফূর্তির ব্যবস্থা কিচ্ছু নেই? আনসাররা তো এগুলো বেশ পছন্দ করে।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফে পাওয়া যায়- 'হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন- তাঁর কাছে উপস্থিত থেকে দুটি মেয়ে ঈদ-উল-আযহার দিনে গান গাইছিল আর বাদ্য বাজাচ্ছিল। নবী করীম (সা.) কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। এ সময় হযরত আবুবকর (রাঃ) তথায় উপস্থিত হলেন। তিনি মেয়ে দুটিকে ধমকালেন। নবী করীম (সা.) মুখের কাপড় সরিয়ে বললেন- 'হে আবুবকর। ওদের গাইতে দাও। এখন তো ঈদের উৎসব।'

ইবনে মাজা'র একটি হাদীসে পাওয়া যায়, 'হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর এক নিকটাত্মীয়া মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন আনসার বংশের এক ছেলের সাথে। তখন নবী করীম (সা.) এসে জিজ্ঞাসা করলেন- 'দুলহিনকে কি পাঠিয়ে দিয়েছ? লোকেরা বলল- জী হাঁ। তিনি বললেন- তার সাথে একজন গায়িকা মেয়ে পাঠিয়েছ কি? লোকেরা বলল- জী না। তখন তিনি বললেন- 'আনসার বংশের লোকেরা খুব গান পছন্দ করে। এ কারণে দুলহিনের সাথে তোমরা যদি এমন একটা মেয়ে পাঠাতে যে গাইতো।'

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ হাসান জামান তাঁর 'সমাজ ও সংস্কৃতি' বইতে লিখেছেন- 'খন্দকের যুদ্ধে হযরত (সা.) পরিখা খননের সময় সাহাবীদের সংগে কাজ করতে করতে সুর করে গেয়েছিলেন- 'লা খাইরা, ইল্লা খাইরাল আখিরা। আল্লাহুম্মা আরহামাল আনসারা ওয়াল মুহাজিরা"। অর্থাৎ আখিরাতের শুভ ছাড়া শুভ নাইকো আর। আনসার ও মুহাজিরে রহম কর পরওয়ার দিগার।"

www.icsbook.info

হানাফী মযহাবের প্রখ্যাত ও সর্বমান্য মুফতী হযরত কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত 'রিসালয়ে সামা' গ্রন্থে লিখেছেন- "বিবাহের প্রচারকার্যে যদি 'দফ্' বাজান জায়েয বা মোস্তাহাব হয়ে থাকে, তবে দফ, ঢোল, তানপুরা, আর নাকাড়া ইত্যাদি অন্যান্য যন্ত্রাদির মধ্যে কি পার্থক্য থাকতে পারে?"

উক্ত গ্রন্থে কাযী সাহেব সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন ঃ 'গান-বাদ্যের বিরোধী হাদীসগুলি মোহাদ্দেসগণের নিকট যঈফ বা অত্যন্ত দুর্বল এবং গান-বাদ্যের পক্ষের হাদীসগুলি মোহাদ্দেসগণের নিকট 'সহীহ' বা 'বিশুদ্ধ'। শামী পঞ্চম খন্ডে লিখিত আছে- 'নিশ্চয়ই বাদ্যযন্ত্র প্রকৃতপক্ষে হারাম নয়। এটা শ্রোতাগণের উদ্দেশ্য বা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। শ্রোতা যদি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রবণ করে এবং বাদকগণ কু-নিয়তে বাজায়, তবে তা তাদের মন্দ নিয়তের কারণে হারাম হবে। নতুবা নিশ্চয়ই হালাল।"

বিশ্ববিখ্যাত শাহানশাহে আউলিয়া, ইসলামের শ্রেষ্ঠতম মোবাল্লেগে আযম, হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর (রঃ) 'সিয়ারুল আরেফীন', 'মালফুজাতে খাজেগান চিশতী' প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, তিনি সুমধুর সুররাজি, মনোহর রাগ-রাগিণী এবং মারফতি গযলকে আল্লাহ্ তাআলার নিগূঢ়তম রহস্য বা আসরারে এলাহী বলে জানতেন। সংগীতের প্রতি হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজের অপরিসীম অনুরাগ ছিল।

হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রঃ)-এর প্রধান খলীফা হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (রঃ) দফ, রবাব ও আড়বাঁশি সহযোগে 'সামার' মাহফিল করতেন।

বিশিষ্ট আউলিয়া হযরত খাজা নিজামুদ্দীন মাহবুবে এলাহীর প্রিয় শিষ্য হযরত আমীর খসরু (রঃ) বহু রাগ-রাগিণী সৃষ্টিসহ ঢোল, তবলা, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। মিসরের বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ইউসুফ কারযাভী তাঁর "আল হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম" বইতে লিখেছেন ঃ 'যারা বলেন যে গান ঠিক নয়, তারা অবশ্যই ভ্রষ্ট। তাদের প্রতিবাদ করে ইবনে হাজম লিখেছেন, রাসূলে কারীম (সঃ) বলেছেন- কার্যাবলীর ভালমন্দ নির্ভর করে নিয়তের উপর।'

সংগীত একটা উঁচু মানের শিল্প। ইসলাম শিল্পচর্চাকে বরাবরই উঁচুতে স্থান দিয়েছে। সুতরাং সংগীত ইসলাম বিরোধী একথা সরাসরি মেনে নেয়া যায় না। যারা সংগীতকে নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী, তারা একটি হাদীসের উদাহরণ দিয়ে বলেন- প্রিয় নবী (সা.) ইরশাদ করেছেন- "বাদ্যযন্ত্র মিটিয়ে ফেলার জন্য আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।" ভুলে গেলে চলবে না এখানে বাদ্যযন্ত্র বলতে ঐ সব যন্ত্রকে বোঝান হয়েছে, যার দ্বারা মানুষের সুপ্ত যৌন আকাংখা জাগরিত হয়। ইসলাম সব ব্যাপারেই সীমালংঘনমূলক আচরণের বিরোধী। ভাত এবং আঙ্গুর ইসলামে নিষিদ্ধ খাদ্যবস্তু নয়। কিন্তু যখনই আঙ্গুর মদে রূপান্তরিত হয়, ভাত নেশার মাদক দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়, তখনই তা হয়ে যায় নিষিদ্ধ বা হারাম। যে গান স্বভাব-মেযাজের সুষ্ঠুতা এনে দেয়, সৎকাজে আগ্রহ

www.icsbook.info

সৃষ্টি করে, আল্লাহর আনুগত্যে উৎসাহ যোগায়, তেমন গান যে ইসলামে নিষিদ্ধ নয়, তার ভূরি ভূরি নজীর কোরআন-হাদীস এবং ইসলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাসের দিকে তাকালেই আমরা দেখতে পাবো। কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী বলেছেন, 'গান হারাম হওয়া পর্যায়ে কোন একটি হাদীসও সহীহ নয়।' ইবনে হাজম বলেছেন- 'এ পর্যায়ের সব বর্ণনাই বাতিল ও মনগড়া রচিত।' (ইউসুফ কারযাভী ঃ ইসলামে হালাল-হারামের বিধান)

ইসলামের সুবহে সাদেক যুগের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই, সে যুগের মুসলমানরা শুধু সংগীত চর্চাই করেননি, আরব, পারস্য, স্পেন, ভারত উপমহাদেশ জুড়ে মুসলমানরাই ছিল বিশ্ব সংগীতের গুরু, সংগীত বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা। সভ্য দুনিয়ার সংগীত শিল্পের নেতা, সুর, তাল, রাগরাগিণী, বাদ্যযন্ত্র ও তাল যন্ত্রের আবিষ্কর্তা। সুরের সুমিষ্টতায় মুসলিম সংগীত কলা পাশ্চাত্যে আজও আদর্শ সংগীত রূপে আদৃত। দশম এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলিম সংগীতকলার উৎকর্ষ বিশ্ব সংস্কৃতির এক অনন্য অবদান হিসেবে স্বীকৃত হয়। স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, ইরান এবং ভারতসহ মধ্য এশিয়ায় মুসলিম সংগীত কলার প্রভাব এখনও বিদ্যমান।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়- ইবরাহীম ও ইসহাক মাওসালি নামে খলীফা হারুনের দুজন সংগীত শিল্পী ছিলেন। আল খলীল ছন্দ বিদ্যার প্রথম পুস্তক রচনা করেন। দার্শনিক আল কিন্দি সংগীত ও সুরের উপর অনেক পুস্তক রচনা করেছেন। বিখ্যাত ইমাম গায্যালী বৈধ এবং অবৈধ সংগীতের এক ফিরিস্তি দান করেন এবং আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় সাধনায় সংগীতকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়, সে সম্বন্ধে তাঁর রচিত 'এহিয়া উল উলুম' নামক পুস্তকে বিস্তারিত লিখেছেন। খলীফা ওলীদ নিজে একজন সুদক্ষ লূট (বাঁশী) বাদক ছিলেন। তিনি 'কিতাবুল কিয়ান' নামে একটা সুরের পুস্তিকাও রচনা করেন। আরবীতে লিখিত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংগীত গ্রন্থ আবুল ফজল ইস্পাহানী রচিত ২১ খন্ডের সংগীত পুস্তক। এই পুস্তকে তিনি একশ সুরের নাম, তাদের ব্যাখ্যা ও উৎস আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন এবং সেই সব সুরের প্রকৃতি ও পরিবেশ বর্ণনা করেছেন। খলীফা আবদুর রহমান কর্ডোভায় প্রথম একটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় থেকে বহু কৃতী ছাত্র পরে সংগীত শিল্পে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইসলামের স্বর্ণযুগে বাগদাদ, কায়রো, দামাস্কাস, সেভিল, গ্রানাডা, টলেডো, ইরান, মধ্য এশিয়া ও স্পেনে বহু সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিখ্যাত খলীফা হারুনের পুত্র ইবরাহীম সে যুগের সংগীত শিল্পীগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

ভারত উপমহাদেশের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাব, মুসলমানরা এদেশে শুধু তাওহীদের অমিয় ধারাই বয়ে আনেনি, সাথে করে বাদ্যযন্ত্র, চিত্রকলা, স্থাপত্যকলা, সংগীত এবং রুচিকর আহার্য প্রস্তুত প্রণালীও এনেছিলেন। সুলতান মাহমুদ একজন সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী সংগীতানুরাগী ছিলেন। তাঁর সভায় যে সব শিল্পী সংগীতে স্বনামখ্যাত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে নাজির খান

www.icsbook.info

বাহরুজ, চাংগী এবং সুবিখ্যাত আরব ইরানীয় কবি আমীর খসরু অন্যতম। আমীর খসরু উপমহাদেশে মুসলিম সংগীত ঘরানার উদগাতা এবং বিখ্যাত খেয়াল সংগীতের আবিষ্কারক। সম্রাট আকবরের সভা গায়কদের মধ্যে বিখ্যাত তানসেনের নাম চির অম্লান হয়ে আছে। তিনি বহু জনপ্রিয় রাগরাগিণী সৃষ্টি করেছেন। উপমহাদেশের ধ্রুপদ সংগীতের আলোচনা করতে গেলেই মুসলিম সংগীতজ্ঞদের নাম প্রথমেই মনে আসবে। তারা সকলেই ছিলেন যুগস্রষ্টা সংগীত শিল্পী। যেমন সুলতান হুসেন শাহ্ শর্কী, নিয়ামত খাঁ (সদারঙ্গ), মুহাম্মদ শাহ, শেখ মৈনুদ্দিন, ওয়াজির আলী, ফিরোজ খাঁ (অদারঙ্গ) দুদ্দু খাঁ, হুস্যু খাঁ, এবং স্মরণকালের ওস্তাদ করিম খাঁ। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন, ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ, ওস্তাদ আমীর খাঁ সহ অসংখ্য মুসলিম সংগীতজ্ঞের অবদান উপমহাদেশের সংগীতকে চির অমর, চির ভাস্বর করে রেখেছে। মুসলমান আমলে সংগীতের বাণী বা বন্দিশ ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের গুণকীর্তন সমৃদ্ধ। যেমন- 'তু-করীম হ্যায়, তু-রহীম হ্যায়। কিংবা 'আরজ শোন মোরি, তুম দাতা ম্যায় ভিখারী' ইত্যাদি। উপমহাদেশের মুসলমানদের পতনের সাথে সাথে তাদের সংগীত ঐতিহ্যেরও পতন ঘটে। আজ সব কিছুর মত সংগীত শিল্পটিও মুসলমানদের হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। যার ফলে এই মহান শিল্পে অনুপ্রবেশ করেছে ব্যভিচার, নৈরাজ্য, অবক্ষয়। মুসলমানরা মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ফলেই সংগীত নির্লজ্জতা ও যৌনতা প্রচারের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এ দোষ সংগীতের নয়, এ অপরাধ সংগীতকে যারা কুপথে ব্যবহার করছে, তাদের। মুসলমানরা যতদিন সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, ততদিন তারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নৈতিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেই সংগীত চর্চা করেছিল। সংগীত জগত থেকে মুসলমানদের মুখ ফিরিয়ে নেবার ফলেই সংগীতে হারাম জিনিসের বিস্তৃতি ঘটেছে। এই বিকৃতির জন্য সংগীত দায়ী নয়, দায়ী এর ব্যবহারকারীগণ।

সুতরাং সংগীত নিকৃষ্ট হতে পারে না। মানব জীবনে বিশুদ্ধ সংগীতের প্রভাব সুদূর প্রসারী। ইমাম গায্যালী সংগীতকে স্নায়ুর ও মস্তিষ্কের খাদ্য রূপে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সংগীতকে চরিত্র সংশোধনের যন্ত্ররূপে বর্ণনা করেছেন। তারা বলেছেন, সংগীত চর্চা মানুষের মধ্যে এক আন্তরচেতনা জাগায়, যা ক্রমে ক্রমে তাকে নিয়ে যায় উন্নততর আধ্যাত্মিক লোকে। সংগীত মানুষের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপিত করে সৃষ্টিশীল প্রতিভার উন্মেষ ঘটায়। সংগীত হৃদয়ে নির্মল ভাবের সৃষ্টি করে অপরাধ প্রবণতা দূর করতে সহায়তা করে। সংগীত মানুষের মনে এক অনাস্বাদিত আনন্দের অনুভূতি জাগায় যার ফলে কিছু সময়ের জন্য হলেও সে ভুলে যায় দুঃখ, কষ্ট, দিন যাপনের ও প্রাণ ধারণের গ্লানির কথা। সংগীতের মোহনীয় শক্তি মানুষকে আত্মোন্নতির পথে সাহায্য করে। মানুষের মনে সুপ্ত ধর্মভাব জাগায়, তার হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রেম জাগরিত করে- যিনি তার কণ্ঠে এই সুর সুন্দরকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার পায়ে আত্মনিবেদনের জন্য ব্যাকুল করে তোলে। মুসলমান সংগীতজ্ঞগণ সুমধুর সুররাজি ও মনোহর রাগ-রাগিণীকে আল্লাহপাকের নিগূঢ়তম রহস্য বা আসরারে এলাহী বলে মনে করতেন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ বলেছেন- সংগীত চর্চার

www.icsbook.info

দ্বারা মানুষের সুকুমারবৃত্তিগুলো শক্তিশালী এবং সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। নিখুঁতভাবে সুর লাগাতে পারলে সৃষ্টিকর্তার দর্শন লাভ সম্ভব।

পদার্থ বিজ্ঞানীরা মনে করেন সংগীত আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তারা আরও বলেছেন, এটা একেবারে আজগুবি নয় যে, সুমধুর সংগীত দ্বারা বায়ুমন্ডলের পরিবেশকে পরিশুদ্ধ করে সর্বনাশা ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবীকে প্রশমিত করা যেতে পারে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাল-লয় সমৃদ্ধ সুমধুর সংগীত দ্বারা অধিক শস্য ফলান এবং দুগ্ধবতী গাভীকে অকৃপণভাবে দুগ্ধদানে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব। সংগীতের মূর্ছনা দ্বারা উটকে দ্রুতগামী করার রেওয়াজ তো আরবে বহুদিন থেকেই প্রচলিত ছিল। একমাত্র সংগীত দ্বারা মানুষ তো অবশ্যই— বনের পশুপাখীকেও বশ করা যায়। মানব জীবনে সংগীতের বহুমাত্রিক প্রভাব নিয়ে যখন পৃথিবীময় গবেষণা চলছে, তখন আমরা একে হারাম ঘোষণা করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলমান পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব।

শরীয়তের বিধান প্রণয়নে সর্বপ্রথম মৌলনীতি হচ্ছে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যত জিনিসই সৃষ্টি করেছেন তা সবই হালাল বা মুবাহ। শরীয়তের বিধান রচয়িতার অকাট্য, সুস্পষ্ট ও প্রমাণিত ঘোষণায় যদি কোনটিকে হারাম বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, তবে কেবল সেইটিই হারাম। কিন্তু কোন বিষয়ে যদি অকাট্য কোন ঘোষণা প্রমাণিত না হয় কিংবা কোন দলীল থেকে যদি সুস্পষ্টভাবে কোন জিনিসের হারাম হওয়ার কথা নিঃসন্দেহে জানা না যায়, তাহলে তার মৌল অবস্থা মুবাহ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তাকে হারাম বলা যাবে না। কোন যঈফ হাদীস এক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গ্রহণীয় হতে পারে না। (ইউসুফ কারযাভী ঃ ইসলামে হালাল-হারামের বিধান)

ইসলামের দ্বিতীয় মৌলনীতি হচ্ছে, হালাল-হারাম ঘোষণা করার অধিকার কেবলমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার। সূরা আল আনয়ামে বর্ণনা করা হয়েছে- "আল্লাহ যা কিছু তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, তা তিনি নিজেই স্পষ্ট ও ভিন্ন ভিন্ন করে তোমাদের জন্য বলে দিয়েছেন।" সুতরাং হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয চিহ্নিত করার কোন অধিকার, কোন আলেম বা ফিকাহবিদদের নেই।

সুতরাং ঘর পুড়ছে বলে দিয়াশলাই উৎপাদন নিষিদ্ধ করা কোন সুচিন্তার লক্ষণ নয়। আজকের সমাজকে সংগীতের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করতে হলে, সংগীত চর্চা নিষিদ্ধ করে নয়, বরং সংগীতের সুপ্রভাবের বিস্তার ঘটিয়েই তা করতে হবে। প্রচার মাধ্যমগুলো থেকে সুস্থ মানবকল্যাণকামী সংগীতের সুবাতাস সমাজে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে মানবীয় প্রবৃত্তিগুলো জাগিয়ে তোলাই হবে সময়ের উপযোগী কাজ। অতএব সুস্থ সংগীত চর্চার মাধ্যমেই অসুস্থ সংগীতকে সমাজ থেকে বিতাড়িত করার শুভ উদ্যোগ এখনই নেয়া দরকার।

০১.০১.৯৬

www.icsbook.info

আরিফুল হক দেশের বরেণ্য নাট্যশিল্পী ও প্রাবন্ধিক। জন্ম ১৯৩৪-এর ১২ই অক্টোবর হাওড়া জেলার বাগনান অঞ্চলের মহাদেবপুর গ্রামে। মাতুলালয়ে। সাত বছর বয়সে নাট্যশিল্পে হাতে খড়ি। বাংলা নাট্য জগতের প্রবাদপুরুষ নামে পরিচিত শিশির কুমার ভাদুড়ীসহ বহু জনের সান্নিধ্যে নাট্যচর্চা করেছেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের (IPTA) সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তাঁর অভিনীত "উত্তরায়ণ" নামে প্রথম চলচ্চিত্র মুক্তি পায় কলকাতায় ১৯৫২ সালে। এ পর্যন্ত তাঁর অভিনীত প্রায় দু'শ' চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছে। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। শিল্পী আরিফুল হক মঞ্চ, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, রেডিওসহ সকল মাধ্যমেই তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি একজন জনপ্রিয় প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট। দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক দিনকাল, দৈনিক ইত্তেফাক, সাপ্তাহিক রোববার, বিক্রম, পালাবদল, প্রেক্ষণসহ বহু পত্রিকায় তিনি নিয়মিত জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ক চিন্তাশীল ও জাগরণ-মূলক প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন।

নাট্য পরিচালক হিসাবেও তিনি দেশে-বিদেশে বহুল প্রশংসিত হয়েছেন।

নাট্য বিষয়ে তিনি বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। ১৯৮১তে বাংলাদেশ থেকে সর্বপ্রথম যে নাট্যদলটি দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বনাট্যোৎসবে যোগদান করেছিল, তিনি তার অন্যতম সদস্য ছিলেন।

আমেরিকান সরকারের আমন্ত্রণে সে দেশে নাট্যচর্চা প্রত্যক্ষ করার জন্য ১৯৮৬ সালে তিনি দু'মাস ধরে আমেরিকার ১১টি অঙ্গরাজ্য সফর করেন। ঐ বছর বিবিসি এবং ভয়েস অব আমেরিকা থেকে তাঁর সাক্ষাৎকার ও নাট্য বিষয়ক আলোচনা প্রচার করা হয়। একই কারণে তিনি ইংল্যান্ড, জাপান, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ভারতসহ বহু দেশ সফর করেন।